আকর

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

CHARU-NITI PATHA

OR

ENTERTAINING LESSONS IN MORALS,

BEING

A COLLECTION OF DIDACTIC TALES & ANECDOTES

WITH

A FEW MORAL ESSAYS.

BY

KALIKRISHNA DATTA.

চারুনীতি-পাঠ।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত

প্রণীত।

PUBLISHED BY MESSRS K. C. DAN AND CO.
No. 11 COLLEGE SQUARE,
CALCUTTA.
PRINTED BY R. K. MOOKERJEE.
AT THE
"SANSAR PRESS" No. 43 COSSIPORE ROAD.
1884.

মুখবন্ধ।

আত্মীয়বর্গের আশাস্থল ও ভাবী সমাজের উপাদান বালকগণ দিন দিন দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বালকগণ পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনকে তাদৃশ সম্মাননা করিয়া চলে না, তাহারা কুনীতি-প্রণোদিত আচরণের দ্বারা গৃহে গৃহে মহা অশান্তি ও উপদ্রব উপস্থিত করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ও দিন দিন বিকসিত হয়, কিন্তু বিদ্যা তাহাদিগকে বিনয়ী করিতে পারে না। জ্ঞানরত্ন সমন্বিত হইয়া কোথায় তাহারা ফলভরে অবনত পাদপসদৃশ শোভা ধারণ করিবে, কোথায় তাহারা চরিত্রবান হইয়া বিমল মুখশ্রী দ্বারা পরিবার, সমাজ ও সাম্রাজ্যের মুখোজ্জ্বল করিবে, না তাহারা শিথিল-চরিত্র হইয়া সকল শুভ আশার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, ইহা কি অল্প আক্ষেপ ও বিড়ম্বনার বিষয়! সুকুমারমতি বালকগণের চরিত্রের এরূপ বিপর্য্যয় ঘটে কেন, কি উপায়ে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের বিমল সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে, ইহা কি অবশ্য চিন্তনীয় নহে?

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যতই মতদ্বৈধ থাকুক, শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আদৌ মতের বিভিন্নতা হইতে পারে না। প্রকৃতি-নিহিত গুণরাশি বিকাশ করিতে, শিক্ষা ভিন্ন কে সমর্থ হয়?

কে না অবগত আছেন যে এই শিক্ষারই অভাবে চরিত্রে সেই সকল সদ্‌গুণ প্রস্ফুটিত হওয়া দূরে থাকুক, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। বালকগণের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে যে সকল শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; অতএব বালকেরা শিক্ষা দ্বারা এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইতেছে, কোন্ বিবেচক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন? শিক্ষার ক্ষেত্র অসীম। প্রকৃতরূপে এই ক্ষেত্রে কার্য্য হইলে, শিক্ষা সুফল ব্যতিরেকে কুফল কখনই প্রসব করিবে না। যে শিক্ষা, শরীর, মন ও আত্মাকে পরস্পর অবিরোধে পরিপুষ্ট করে,—সেই সমঞ্জসীভূত শিক্ষা দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল দেশ মধ্যে অতীব বিরল হইয়া উঠিয়াছে। বালকেরা যে ভাবে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মনোবৃত্তি সতেজ করাই যেন এই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে, আত্মার কি দশা হইতেছে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে, ইহা যেন আদৌ চিন্তনীয় বিষয় নহে। সৌভাগ্যক্রমে কিয়দ্দিনাবধি বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক, এইরূপ একটী রব উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই রব অনুসারে কতদূর কার্য্য হইতেছে দেখিতে গেলে ঘোর নৈরাশ্যে পতিত হইতে হয়। অতি অল্প বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, বা এই শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ পঠিত হয়। অপরন্তু উক্তবিধ গ্রন্থ পঠিত হইলেও অধ্যাপনার দোষে উহা তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য

যে এই প্রকার গ্রন্থের অভাবও বড় অল্প নহে। এই অভাব দূরীকরণার্থে কোন কোন সদ্বিদ্বান মহাত্মা চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু এই অভাবের আধিক্য হেতু আমার ন্যায় ক্ষুদ্রধীরও কিছু করিবার আছে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নীতিশিক্ষারূপ সুমহৎ কার্য্যে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়নে সাহসী হইলাম। ইহা যে কেবলই বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে এরূপ নহে, কিন্তু প্রত্যেক গৃহের বালক বালিকার করকমলে ইহার এক এক খণ্ড শোভা পায়, ইহাও গ্রন্থকারের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে ইহাও ব্যক্তব্য যে এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ ধর্ম্মবন্ধু, সখা, সময় ও বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সকল প্রবন্ধ ও তাহার সহিত দুই একটী নূতন প্রবন্ধ সংযোজন করিয়া পুস্তকাকারে সাধারণের গোচর করিতে সাহসী হইলাম। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই গ্রন্থের শেষ ভাগে যে কয়েকটী প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাষা পূর্ব্বভাগের গল্প-মূলক নৈতিক উপদেশ অপেক্ষা অনেক কঠিন, কারণ ইহা শুদ্ধ বিদ্যালয়ের নিম্ন বা মধ্য শ্রেণীস্থ বালক বালিকাগণের পাঠ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা উচ্চ শ্রেণীস্থ বালক বালিকা ও সাধারণের পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে একটু স্থান লাভ করিতে পায় ইহাও লেখকের আন্তরিক বাসনা।

পরিশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি

যে কলিকাতার সুবিখ্যাত সিটী কলেজের অধ্যক্ষ ও বামাবোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন এবং প্রুফ্ সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব কাশীনাথ স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং উক্ত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, উভয়েই আমাকে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। উল্লিখিত মহাত্মাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। সহোদর-প্রতিম ভাই ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সময়ে সময়ে প্রুফ্ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

এক্ষণে আশাপূর্ণ অন্তরে প্রার্থনা করি যে, যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল, সকল সাধুসঙ্কল্পের পরম সহায় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাহা যেন সফল হয়।

আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা
বরাহনগর।
২৬শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১২৯১।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত।

সূচীপত্র।

চারুনীতি পাঠ

মার্টিন নামে এক দরিদ্র বালক পত্রবাহকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক দিবস কোন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হওয়াতে, পথপার্শ্বে একটী সরাইয়ের বহির্দ্বারের নিকট এক বৃহৎ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সে বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে এক খণ্ড রুটী ছিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মার্টিন রুটী খাইতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল একখানি সুন্দর গাড়ী ঐ পান্থশালার অভিমুখে আসিতেছে, তাহাতে একটী যুবা ভদ্রলোক ও তাহার শিক্ষক মহাশয় আরূঢ় ছিলেন। সরাইরক্ষক দ্বারে গাড়ী আসিবামাত্র বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি গাড়ী হইতে নামিবেন?" পথিকেরা বলিলেন, "আমাদের নামিবার সময় নাই, গাড়ীতেই খাবার আনিয়া দাও।"

ইতিমধ্যে মার্টিন অভিনিবিষ্টচিত্তে উহাদিগকে দেখিতেছে, আর এক একবার আপনার সেই কদর্য্য খাদ্য আর নিকৃষ্ট পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধস্ফুট

স্বরে বলিতে লাগিল, "হা অদৃষ্ট! আমি এই দরিদ্র পত্রবাহক মার্টিন না হইয়া যদি ঐ যুবা ভদ্রলোক হইতাম—হায়! উনি যদি আমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করেন।"

ঐ যুবার শিক্ষক মার্টিনের অগোচরে তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া ছাত্রকে সমুদয় জ্ঞাত করিলেন। তাহাতে যুবক গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া মার্টিনকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন আর বলিলেন, "ক্ষুদ্র বালক, তবে তুমি কি আমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিবে?"

মার্টিন তটস্থ হইয়া বলিল, "না, না, মহাশয়! আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না।"

যুবক বালকের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি রাগ করি নাই, বরং আমি তোমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি।"

মার্টিন বলিল, "না মহাশয়! আপনি পরিহাস করিতেছেন, আপনার মত ভদ্র ধনাঢ্য যুবকের কথা দূরে থাকুক, এ জগতে এমন কেহই নাই যে আমার ন্যায় হতভাগার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। আমাকে প্রত্যহ অনেক ক্রোশ করিয়া হাঁটিতে এবং যৎসামান্য কষ্টোপার্জ্জিত আহারে দিনপাত করিতে হয়।"

যুবক বলিলেন, "ভাল, আমার যাহা নাই, কিন্তু তোমার আছে তাহা যদি আমাকে দাও, আমি তাহাহইলে আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই তোমাকে প্রতিদান করিতে পারি।"

মার্টিন অবাক হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিক্ষক

বালককে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই প্রকার বিনিময়ে স্বীকৃত আছ?"

মার্টিন বলিল, "সত্য সত্যই আমি সম্মত আছি, কিন্তু আমার বোধ হয় আপনারা আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন। আহা! তাহা হইলে আমাদের গ্রামের লোকেরা এই উৎকৃষ্ট গাড়ী করিয়া আমাকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া কেমন আশ্চর্য্য হইবে।" এই চিন্তা করিয়া বালক ঈষৎ হাস্য করিল।

ঐ যুবা ভদ্রলোক আপনার ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন। আদেশ মাত্র তাহারা দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিতে সাহায্য করিল; কিন্তু যখন মার্টিন দেখিল যে যুবার পদদ্বয় সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিরহিত, তখন তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আর একটু অভিনিবেশ সহকারে মার্টিন দেখিতে পাইল ভদ্রলোকটী কেবল যে খঞ্জ তাহা নহে, তাহার বদন চিররোগীর ন্যায় মলিন ও কৃশ। যুবা মার্টিনের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "তবে বালক! তুমি কি আমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর? তুমি কি আমাকে তোমার সবল চরণ ও রক্তাভ বদনমণ্ডল আমার এই অকিঞ্চিৎকর যান ও বসনের বিনিময়ে দান করিতে (যদি এরূপ করা সম্ভব হয়) সম্মত আছ?"

মার্টিন বলিল, "না, মহাশয়! সমস্ত জগতের বিনিময়ে আমার এই অমূল্য অধিকার হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত নহি।"

"এদিকে যুবা ভদ্রলোকও বলিলেন, আমি যদি স্বেচ্ছামত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিতে পারি, তাহাহইলে আমি দীন

দুঃখী হইলেও আপনাকে পরম সুখী ও ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিব। কিন্তু যেহেতু পরমেশ্বরের ইচ্ছা যে আমি এ প্রকার খঞ্জ ও রুগ্ন থাকি, আমি সাধ্যমত সহিষ্ণু ও সন্তুষ্ট থাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করি এবং ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়া অপরাপর যে সকল সুখ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। হে বালক! তুমিও সেই প্রকার করিবে। সর্ব্বদা স্মরণ করিবে যে দয়াময় ঈশ্বর তোমাকে স্বাস্থ্য ও বলরূপ যে অমূল্য সম্পত্তি দিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট যান বা অশ্বের ন্যায় সামান্য পদার্থের সহিত কখনই বিনিময় হইবার নহে।"

এক জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ও একটী ক্ষুদ্র বালক।

এক জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু কিছুই বোধগম্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তিনি সমুদ্রজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, কিন্তু কি জানি জীবনের প্রতি কেমন আশ্চর্য্য মমতা যে সহসা ঐ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইল, আর তাঁহার পা উঠিল না। তিনি কিছু সময় সমুদ্রতটে পদচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্মুখস্থ জলধির উপর অসংখ্য তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে রাশি রাশি চিন্তা একটীর পর আর একটী উদয় হইয়া বিলীন হইতেছিল।

এদিকে সেই বালুকাময় তীরে একটী ক্ষুদ্র বালক গর্ত্ত

খুঁড়িয়া শম্বুকের দ্বারা সমুদ্র হইতে জল আনিয়া তাহার মধ্যে ঢালিতেছিল। ঐ অবোধ বালকের কার্য্য দৃষ্টিগোচর হওয়াতে পণ্ডিত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষুদ্র বালক! তুমি এ কি করিতেছ?" বালক উত্তর দিল, "কেন, আমি এই সমুদ্রের সকল জল এই গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া নিঃশেষিত করিব।"

পণ্ডিত বলিলেন, "তা পারিবে?" এই প্রশ্ন করিয়াই জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতের জ্ঞানোদয় হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কি! আমিও ত এই অবোধ বালকের ন্যায় অপরিমেয় অনন্ত বাক্য মনের অগোচর ভূমা পরমেশ্বরকে এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা পরিমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম! হায়! হায়! আমি কি মূর্খ!" এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি আত্মহত্যা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বিনম্রভাবে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ পণ্ডিতের নাম উদাসীন সেণ্ট আগষ্টাইন্।

অদ্ভুত কর্ত্তব্য সাধন।

ভক্তিভাজন বিড্ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দমব্রিয়া প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শান্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, গ্রন্থ রচনা ও ধর্ম্ম প্রচারাদি কার্য্যে অতিবাহিত হয়। তিনি জীবনের শেষ দশায় "সেণ্টজন্ লিখিত সুসমাচার" নামক পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। রোগ-শয্যাগত হইলেও মহাত্মার অবলম্বিত কার্য্যের

বিরাম হইল না। কতকগুলি ছাত্র তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিত, তিনি মুখে মুখে যাহা অনুবাদ করিতেন তাহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিত। একদিন পীড়ার আতিশয্য বশতঃ তিনি প্রিয় ছাত্রদিগকে বলিলেন, "আমি আর কতক্ষণ জীবিত থাকিব? স্রষ্টা আমাকে অতি শীঘ্রই গ্রহণ করিবেন কি না জানি না, সত্বর লিখ।"

ঈশ্বর কৃপায় সে দিন নিরাপদে গত হইল। পরদিন একটী ছাত্র বলিল, "মহাশয়! এখনও আর এক অধ্যায় অবশিষ্ট রহিয়াছে, আর অধিক কথা বলিতে কি কষ্ট ও বিরক্তি বোধ করেন?" মহাত্মা বিড্ বলিলেন, "না, কোন কষ্ট নাই, তৎপর হও, লেখনী লও, শীঘ্র লিখ।"

এইরূপে সে দিবসও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আনন্দে অতিবাহিত হইল। তৎপরে যে ছাত্র তাঁহার হইয়া লিখিতেছিল, বলিয়া উঠিল, "আর একটী মাত্র বাক্য লিখিলেই হয়।" তিনি বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র লিখ।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ছাত্র বলিল, "এক্ষণে সমাপ্ত হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "ভাল তুমি ঠিক বলিয়াছ, সকলই ফুরাইয়াছে, আমার মাথা তুলিয়া ধর, এ সময় পবিত্র উপাসনা স্থানের সন্মুখে উপবিষ্ট থাকা অতি সুখকর। আমি সেই স্থানে বসিয়া স্বর্গীয় পিতাকে একবার ডাকি।"

এই বলিয়া মহাত্মা বিড্ পরমেশ্বরের মহিমা গান করিতে করিতে শান্তিধামে গমন করিলেন।

—০:০—

নির্ভরহীনতা।

কোন সময়ে এক ব্যক্তি সস্ত্রীক জনৈক দূরস্থ বন্ধুর গৃহে যাইয়া তথায় একটী দিবস যাপন করিবার মানস করিয়াছিল। একদিন মনোহর প্রভাত সময়ে তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল, কিন্তু কিছু দূরে গমন করিয়াই স্ত্রীলোকটীর মনে পড়িল যে তাহাদিগকে একটী জীর্ণ সেতু পার হইতে হইবে। সকলেই বলিত যে ঐ সেতু নিরাপদ নহে।

এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সে তাহার স্বামীকে বলিল, "আমরা সেতুর নিকট গিয়া কি করিব? আমার ত তাহার উপর দিয়া যাইতে সাহস হইবে না, আর নদী পার হইবারও অন্য উপায় দেখি না।"

তাহার স্বামী বলিল "অহো! ঐ সেতুটার কথা আমার মনে ছিল না। হায়! যদি উহা ভগ্ন হয়, তাহা হইলে ত আমরা পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হইব।"

স্ত্রী বলিল, "তা যেন না হইল, কিন্তু যদি কোন জীর্ণ গলিত তক্তার উপর তুমি পা দেও আর তোমার পা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাহইলে আমার ও খুকীর দশা কি হইবে?"

তাহার স্বামী বলিল "তাহা কেমন করিয়া জানিব, তবে বোধ হয় এই হইবে যে আমি আর কাজ করিতে পারিব না এবং আমরা সকলে অনাহারে মারা যাইব।"

এইরূপে নিতান্ত চিন্তাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহারা ক্রমাগত যাইতে যাইতে অবশেষে সেতুর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। উপস্থিত হইয়া দেখে যে তাহারা গতবারে সেতু যে প্রকার দেখিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই নাই, তাহার

স্থানে এক নূতন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহারা অবাক্ হইয়া নিরাপদে সেতু উত্তীর্ণ হইল এবং ভাবিতে লাগিল যে তাহারা অমূলক দুশ্চিন্তা করিয়া মিছামিছি কষ্ট পাইয়াছে।

উপরে যে গল্পটী বর্ণিত হইল তাহার মধ্যে একটী অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে। আমরা যে জগতে রাশি রাশি দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার অনেকের মূলে কি এই দেখিতে পাওয়া যায় না যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে না পারাতে আমরা কল্পনার সাহায্যে অনেক সময়ে নূতন নূতন বিপদের ছবি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া আবার তদ্দর্শনে নিজেই ভীত ও চিন্তাকুল হই? কবে একটা দুর্ঘটনা বা বিপদ ঘটিবে এই ভাবিয়া অনেক সময়ে আমাদের চক্ষু কপালে উঠে, কিন্তু যদি আমরা নির্ভরশীল হইতে পারি, যদি মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি, তাহাহইলে আমরা অনায়াসেই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া যাই। সেই মহাত্মাই ধন্য যিনি সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন।

——০ঃ০——

নির্ভরশীলতা।

"পিতা আমার ডেকের উপর আছেন ত?"

কয়েক বৎসর অতীত হইল কোন জাহাজের কাপ্তেন একবার সপরিবারে জলপথে গমন করিতেছিলেন। এক রজনীতে সকলে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইয়া পোতকে মগ্নপ্রায় করিল, জাহাজ এক-

পাশ হইয়া পড়িল, এবং ইহার উপরের দ্রব্য সকল পরস্পর সংঘর্ষিত হওয়াতে ঝন্ ঝন্ শব্দ হইয়া উঠিল, কোনটা বা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। আরোহিগণ প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোরতর বিপদ গণনা করিয়া প্রাণভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। সকলে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অন্যান্য আরোহিগণের মধ্যে কাপ্তেনের একটী অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা ছিল। সেই বালিকাও অপর সকলের সঙ্গে জাগ্রত হইয়াছিল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে," তাহাকে বলা হইল "প্রবল ঝটিকা জাহাজকে ভূমি সংলগ্ন করিয়াছে। বালিকা বলিল, "পিতা আমার ডেকের উপর আছেন ত?" বালিকা ক্ষুদ্র মাথাটী তুলিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, এক্ষণে তাহার পিতা 'ডেকের' উপর আছেন শুনিয়া, পুনরায় মস্তকটী উপাধানের উপর রাখিয়া, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত মনে, সেই প্রবল তরঙ্গ ও ঝটিকা সত্ত্বেও মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

ধন্য বালিকা! ধন্য তুমি! তোমার সরল নির্ভরশীলতার তুলনা কোথায়? তুমি পিতার উপর এরূপ নির্ভর করিতে পারিলে যে সন্দেহ, অবিশ্বাস,বিপদ গণনা, এমন কি মৃত্যুভয়ও তোমার হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিল না। তুমি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইলে! পিতা যখন 'ডেকের' উপর আছেন তখন আর ভয় কি? ধন্য সন্তান! ধন্য তুমি! তোমার নির্ভরশীলতা ভাবিলে আমাদের মনে বড় ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয়। তুমি তোমার পিতার উপর নির্ভর করিয়া

অভয় হইলে, কিন্তু আমরা এমনি দুর্ব্বিনীত ও অহঙ্কারী যে আমরা সরল প্রাণে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে আমাদের পরম পিতার উপর নির্ভর করিতে পারি না। অভয়দাতা জগৎ-পিতার উপর নির্ভর করিলে যে সকল প্রকার বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে আমরা অবিচলিত ও স্থির থাকিতে পারি, এ জ্ঞান আমাদের হয় নাই, আবার এ জ্ঞান থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধন্য বালিকা! তুমি তোমার বিপদের সময় পিতার উপর নির্ভর করিলে, কিন্তু আমাদের কি বিপদ আপদ নাই? আমাদের অনেক বিপদ আছে, এমন বিপদ সময়ে সময়ে আমাদের ঘটিয়া থাকে যে স্থলে মনুষ্যের সহায়তা বিফল হয়, অথচ এমনই আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি যে সে স্থলেও নিজের বলবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া প্রাণে মারা যাইব, তথাপি পরমপিতার অভয়পদ আশ্রয় করিয়া নিরাপদ হইতে পারি না। এ কি বিড়ম্বনা! অনন্ত দয়ার আধার অসীম ক্ষমতাপন্ন যে পিতা, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে কি আবার ইতস্ততঃ করিতে হয়? প্রাণের প্রাণ যিনি তাঁহার হস্তে প্রাণ সমর্পণে কি আবার সন্দেহ করিতে আছে?

জগতে ক্ষুদ্র বা সামান্য কি?

জগতে ক্ষুদ্র বা সামান্য কাহাকে বলিব জানি না। দেখিতে পাই ক্ষুদ্র বস্তুও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে। বৃহৎ বৃহৎ নদীর উৎপত্তি স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস বা নির্ঝরিণী ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোতের গতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ণের দ্বারা নিয়মিত হয়; একটী মাত্র বাক্য, দৃষ্টি, হাস্য, ভ্রূভঙ্গী

বা কার্য্য অতি সামান্য হইলেও অকিঞ্চিৎকর নহে, সে সকল মহান্ অনর্থ ঘটাইতে বা উপকার সাধন করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

যদি কাহারও নিকট ঋণী থাক, সেই ঋণ অল্প হইলেও পরিশোধ করিতে ভুলিও না; যদি কাহার নিকট কোন অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহা সামান্য হইলেও সেই কথা মত কার্য্য করিতে অবহেলা করিও না; যদি কাহাকে কোন আশা দিয়া থাক, সেই আশা পূরণ করিতে অমনোযোগী বা বিস্মৃত হইও না। নিদারুণ শোকসন্তপ্ত চিত্তের পক্ষে একটী সুমধুর সান্ত্বনাসূচক বাক্য কত প্রীতিপ্রদ তাহা কি জান না? ভীষণ বালুকাময়, পাদপ-শূন্য, বারিহীন মরুভূমির মধ্যে শুষ্কতালু শুষ্ককণ্ঠ পথিকের পক্ষে এক পাত্র জল কোটী কোটী স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষাও কি অধিকতর মূল্যবান নহে? ঐ যে চন্দ্রাতপ তুল্য গগণমণ্ডলে হীরকোজ্জ্বল তারকা সকল মিটি মিটি জ্বলিতেছে, উহারা ক্ষুদ্র হইলেও কি দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে আলোক দিয়া পথ প্রদর্শন করিতেছে না?

অতএব জগতে ক্ষুদ্র বা সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কিছুই নাই।

———০ঃ০———

বিনয়।

কোন সময়ে একটা ছাগল এক পর্ব্বতের উপর একাকী যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের কোমল

শাখা ও পল্লব এবং তৃণাদি ভক্ষণ করিবার জন্য সে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে পদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে অবশেষে একটা দুরারোহ শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অত্যুচ্চ শৈল শিখরের পার্শ্ব দিয়া একটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পথ গিয়াছিল। এই পথে ছাগটী বিচরণ করিতে করিতে যেমন মোড় ফিরিতে যাইতেছে, অমনি সেই অপ্রশস্ত পথে ঠিক তাহার সন্মুখে, সে আর একটা ছাগকে দেখিতে পাইল। ঐ পথ একটী ছাগ যাইবার পক্ষেও প্রশস্ত ছিল না; অতএব যদি একের পার্শ্ব দিয়া অপরটী চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিত, উভয়কেই পর্ব্বত হইতে সুদূরে নিম্নে পড়িয়া বিনষ্ট হইতে হইত। এদিকে পশ্চাতে ফিরিবার তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। এক্ষণে তাহারা করে কি? এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া দুইটী ছাগল পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। কিছু দূর হইতে কোন পথিকের উহা দৃষ্টিগোচর হইল। সে নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগকে সেই কৌতুকজনক দৃশ্য দেখাইবার জন্য দৌড়িয়া ডাকিতে গেল! দেখিতে দেখিতে দলে দলে লোক আসিয়া জুটিল। দুইটী ছাগল প্রথমে পরস্পর কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে একটী ছাগল সতর্কতার সহিত প্রথমে এক তৎপরে অন্য পদটি মুড়িয়া, পর্ব্বতের পার্শ্ব ঘেঁসিয়া, পথের উপর শুইয়া পড়িল। তার পর অপর ছাগলটী তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই সঙ্কট স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উভয় ছাগ আবার যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। সমবেত গ্রামবাসিগণ সকলেই ছাগ দুটীকে নিরাপদ দেখিয়া মহোল্লাসে করতালি ধ্বনি করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গল্প একটী সত্য ঘটনা। ইহা হইতে কি আমাদের শিখিবার কিছুই নাই? ছাগাদি নিকৃষ্ট জন্তুগণ সময়ে সময়ে এমন এক একটী কৌতুক ও বিস্ময়জনক আচরণ প্রদর্শন করে, যাহা দেখিলে ও যাহার অনুসরণ করিলে মনুষ্য কতই উপকার পাইতে পারেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই জগতের লোক এমনই দুর্ব্বিনীত যে কেহ কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত নহেন, তাই জগতে কত সময়ে কত মহান্ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। একটি বিনয়সূচক বাক্য বা আচরণ কত সময়ে কত ভীষণ যুদ্ধ নিবারণ করিয়া কতশত মনুষ্যকে অস্বাভাবিক অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিত—একটী বিনয়সূচক বাক্য বা আচরণ কত সময়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায় অপ্রণয়, কলহ, সর্ব্বস্বান্তকারী মকর্দ্দমা প্রভৃতি গুরুতর অমঙ্গল ও বিপৎপাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া পারিবারিক বিমল সুখের স্রোতকে অনিরুদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইত—কত সময়ে কত কুপিত জনের দুর্জ্জয় ক্রোধ, কত অভিমানীর প্রচণ্ড অভিমান, ইত্যাকার বিসদৃশ ভাব বিদূরিত করিয়া পৃথিবীকে এক অপূর্ব্ব সুখ ও শান্তির নিলয় করিতে পারিত। কিন্তু হায়! মনুষ্য সহজে নতশির হইতে চায় না। সে বুঝিবে না যে মস্তক অবনত করাতেই তাহার সমধিক গৌরব ও অনুপম শোভা হইয়া থাকে! জগতে দেখিতে পাওয়া যায় লোকে ধনজন, বলবুদ্ধি, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ধনী যদি বিনয়ী হন, বলবান যদি নিরীহ হন, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান যদি ফলভরাবনত-পাদপ

সদৃশ হন, সুশ্রী হইয়া যদি গর্ব্বহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেমন এক অপূর্ব্ব দেবদুর্লভ শোভা হয়, যাহা দেখিয়া লোকের প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া যায়। অপরন্তু দুর্ব্বিনীতের স্পর্দ্ধা, আস্ফালন, তাহার সগর্ব্ব পদনিক্ষেপ ও অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালন বিষলিপ্ত শরের ন্যায় লোককে আহত করে। সুকোমল সুরভি কুসুম-বিনিন্দিতা কুমারীর সহিত উচ্চণ্ড ব্যাঘ্র সদৃশ বর্ব্বরের যে প্রভেদ, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের সহিত শেষোক্ত ব্যক্তিগণের কি তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ নহে?

যে বিনয় এতদূর আবশ্যক তাহা যেন প্রত্যেক লোকের চরিত্রের ভূষণ হয়, কারণ শতসহস্র গুণ এক বিনয়ের অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বিনয়ী হইতে হইলে হৃদয়কে তৃণসম কোমল করিতে হইবে, নচেৎ মৌখিক বিনয়, যাহা ধূর্ত্ত স্বার্থ-পর লোকের কার্য্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ, যাহা কেবল অসার বাক্যময়, তাহা কখনই প্রকৃত "বিনয়" পদ বাচ্য হইতে পারে না। বিনয়ী হইতে হইলে যে বিনয়সূচক বাক্য শিখিতে হইবে তাহা নয়। যদি তোমার বাক্‌পটুতা না থাকে তাহাতে কি? তোমার চক্ষু, তোমার বিনম্র মুখশ্রী সহস্র রসনার ন্যায় বিনয় প্রকাশ করিয়া দিবে। কোন কোন ব্যক্তির এমনি বিশ্বাস যে বিনয়ী হইলে জগতে চলা ভার হইবে, পদে পদে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত বিশ্বাস আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ জগতে এমন পাষাণহৃদয় কয় জন আছে যাহারা সেই বিনয়ীর প্রশান্ত ও অটল মুখশ্রী দেখিয়া আবার তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে সাহসী হইবে? সেই বিনম্র

দেহে আঘাত করিতে কাহার না হৃদয় কম্পিত হইয়া হস্ত অসাড় হইয়া যাইবে? বিনয়ী প্রফুল্লমুখে শত্রুর আঘাত সহ্য করিয়াও যখন তাহাকে ক্ষমা করেন, তাহার শুভ কামনা করিতে থাকেন, এমন হিতাকাঙ্ক্ষী সুশীলাচার বন্ধুর প্রতি আর কি কেহ শত্রুতাচরণ করিতে পারে? কখনই না। অতএব উল্লিখিত ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় বিনয়ের অধিকারী হইবার জন্য সকলেরই যে সচেষ্টিত হওয়া আবশ্যক তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে, বিনয় সাধনের দুই একটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছেঃ—

১ম। আপনার ক্ষুদ্রতার বিষয় চিন্তা করা।

২য়। অহঙ্কারকে হৃদয়ে ক্ষণমাত্র স্থান না দেওয়া; বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে মনুষ্যের অহঙ্কার করিবারও কোন কারণ নাই।

৩য়। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও নরের ভ্রাতৃভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা।

ক্রোধোদয়ের কারণ নির্দ্দেশ, ও তন্নিবৃত্তির উপায়।

আপনার অনভিমত অপরের কার্য্যে আমাদিগের প্রায়ই ক্রোধ হইয়া থাকে। ক্রোধ অধিকাংশ সময়ে হঠাৎ হইয়া পড়ে। এমন কি অনেক দিন এরূপ মনে করা যায় আর ক্রোধ করিব না, কিন্তু তথাপি কেমন অকস্মাৎ ইহা ঘটিয়া থাকে।

উদ্রেক। মনে কর কাহাকেও একটী কার্য্য করিতে আদেশ করা হইল। সেই কার্য্যটী সম্পাদিত হওয়া অতিশয় আবশ্যক। সম্পন্ন না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে কার্য্য অসম্পন্ন থাকিলে ক্রোধ সঞ্চার হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

নিবৃত্তি। যাহাকে আদেশ করিতে হইবে সেই লোকের প্রকৃতি জানা আবশ্যক। সেই লোক পূর্ব্বে আদেশ পালন করিতে কি প্রকার আচরণ করিয়াছে। যদি সে মনোমত কার্য্য করিতে পারগ জানা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আদেশ করিতে পারা যায়। সেইরূপ স্থলে বিশেষ গুরুতর কারণ না ঘটিলে আর আদিষ্ট কার্য্য অসম্পন্ন থাকিবে না। আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। আদিষ্ট ব্যক্তিকে সেই কার্য্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ অনেক স্থলে দেখা যায় যে কোন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আদেশ পালনে বিমুখ না হইয়াও ভ্রমক্রমে অর্পিত কার্য্য সমাধা করিতে ভুলিয়া যান। ক্রোধ হঠাৎ হইয়া পড়ে। অতএব ইহা নিবারণের বিশেষ উপায় এই—ক্রোধোদয় মাত্র কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকা। কারণ ক্রোধের স্বভাব এই যে ইহা অনেকক্ষণ থাকে না। ছেলেদের কোন পাঠ্য পুস্তকে আছে :—

"দপ্ করে জ্বলে উঠে আগুন যেমন,
থপ্ করে হয়ে পড়ে রাগও তেমন"।

বাস্তবিক ক্রোধের স্বভাবই এই।

উদ্রেক। যে সকল লোককে আমরা দেখিতে পারি না, তাহাদের কাজে প্রায়ই ক্রোধ হইয়া থাকে। এমন কি

তাহাদের সামান্য ভ্রম প্রমাদ ত্রুটি দেখিয়াই আমরা বিরক্ত ও কুপিত হই।

নিবৃত্তি। সকল লোককে ভালবাসিতে শিক্ষা করা উচিত। সমস্ত নরনারী ঈশ্বরের সন্তান, তিনি পাপী, তাপী, সাধু, অসাধু কাহাকেও ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন না, সকলকেই অযাচিত ভাবে অবিশ্রান্ত দয়া প্রদর্শন করিতেছেন। সে স্থলে আমরা দোষবিশিষ্ট সামান্য মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে আমাদিগের অপ্রিয় লোকদিগকে ঘৃণা করিব? আর ইহাও দেখা যায় যে সকল লোকেরই কোনও না কোন বিশেষ সদ্‌গুণ আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এবং দোষ ভাগের প্রতি মনোযোগী না হইয়া আমরা সকলকেই হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে পারি। একবার ভালবাসিতে পারিলে আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার প্রতি ক্রোধ হইবে না।

উদ্রেক। মতবিভিন্নতা প্রযুক্ত অপর লোকের প্রতি প্রায়ই ক্রোধ হইয়া থাকে।

নিবৃত্তি। সকল মনুষ্যই ভ্রান্তিশীল, ইহা বিশ্বাস করিলেই হইল। আমি যে মনে করিতেছি যে আমার মতই যথার্থ, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর ঠিক্ হইলেও যে অপরে ভুলিবে না, তাহাও সম্ভবপর নহে।

সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে।

এক দিন শনিবার বৈকালে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটীর পর আপন আপন গৃহে যাইতেছিল। যাহাদের বাড়ী

নিকটে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহে ফিরিয়া না আসিয়া পরস্পরে কথোপকথন কিম্বা খেলা করিবার জন্য মিলিত হইল। অপর যাহারা দূর হইতে পড়িতে আসিত, তাহারা শীঘ্র পরিবার বর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুত-পদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। শেষোক্ত সন্তানগণের মধ্যে একটী বালক ও আর একটী বালিকার বাড়ী অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে। তাহাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া আসিতে হইত; কিন্তু তাহারা অতি দুর্দ্দিন ব্যতীত অন্য কোন দিবস বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত না। তাহারা দুই ভাই ভগিনী। নলিন সৎ ও সতর্ক বালক বলিয়া তাহার হস্তে ক্ষুদ্র ভগিনী কুন্দকে সমর্পণ করিয়া মাতা নিশ্চিন্ত হইতেন। যদি কোন দিন পথিমধ্যে বৃষ্টি হইত, তাহাহইলে নলিন আপনার জামার দ্বারা কুন্দকে ঢাকিয়া লইত। পথের যে স্থানে পাথর লাগিয়া পা দুটীতে আঘাত লাগিতে পারে, সেই স্থানে নলিন প্রিয় ভগিনীর হাত দুটী ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে তাহাদের একটি ছোট খাল পার হইয়া যাইতে হইত। নলিন কুন্দকে পিঠে করিয়া সেই খাল পার করিয়া দিত। এদিকে কুন্দও নলিনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। ভাই ভগিনীকে পাঠের সময় ভিন্ন প্রায় কখনও সঙ্গ ছাড়া হইতে হইত না, তাহার কারণ কুন্দ বালিকাদিগের সহিত স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে পড়িত। ছুটী হইলে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা লাফাইতে লাফাইতে, হাসিতে হাসিতে, দুজনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইবে বলিয়া নলিনের নিকট আসিত। কিন্তু আজ বৈকালে নলিন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল যে কুন্দের আর

সে প্রফুল্লভাব নাই, সে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের স্কুলের দিকে আসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে। হাত দুটী ধরিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া নলিন ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয় ভগিনি! আজ তোমার কি হইয়াছে?" নলিনের এই কথা শুনিয়া কুন্দমালা সমুদায় ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে এত ফুঁপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতেছিল যে নলিন তাহার একটীও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কতকগুলি বালক বালিকা তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিল। ঘটনা এই—বালিকা বিদ্যালয়ের একটী বড় মেয়ে কুন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই দিন প্রাতে কুন্দ তাহার নিকট হইতে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ একটী ছোট চক্‌চকে মেটে পাত্র পাইয়াছিল। পাঠের সময় স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সেই পাত্রটী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ছুটীর পর কুন্দমালা সঙ্গিনীদিগকে দেখাইবার জন্য তাহা লইয়া বাহিরে আসিল। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে এক খানা বেঞ্চের উপর পাত্রটী রাখিয়া যেমন সে শক্ত করিয়া কাপড় পরিতেছিল, অমনি ভূপাল নামে একটী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া জোর করিয়া উহা কাড়িয়া লইতে গেল। কুন্দ বিস্তর মিনতি করিল, এমন কি তাহার হাত দুটি ধরিল, কিন্তু গোঁয়ার বালক অতিশয় রাগিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল যে সে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তার পর ঐ দুষ্ট বালক ভাঁড় হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, "না, নিব না বই কি? আমার খুসী, আমি এক শ বার নিব।" অন্যান্য বালক বালিকারা যদি ঐ দুষ্ট বালকের রাগের মাথায়

তাহাকে কিছু না বলিত কিম্বা বুঝাইয়া দু একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু সকলেই একবারে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ছি! ছি! করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার হাত হইতে ভাঁড় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এইরূপ করাতে ভূপালের রাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে সে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু দূরে দৌড়িয়া গিয়া বেচারা কুন্দের প্রিয় সামগ্রী সেই মাটির ভাঁড়টী দেয়ালে আছাড় মারিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল, "কেমন কুন্দ এই বার আসুক্ না, আর ভাঁড় নিয়ে যাক্ না।" বলা বাহুল্য সাধের ভাঁড়টী খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, এবং ইহাই আজ বালিকা কুন্দের দুঃখের কারণ। নলিন চুপ করিয়া এই কথাগুলি শুনিল। তার পর ভগ্নীর হাত ধরিয়া দুজনে বাড়ীর দিকে ছুটিল। নলিনের স্বাভাবিক হাসি হাসি মুখ খানি আজ বড় দুঃখে ভার হইয়াছে। বালিকার স্বভাব বড় সরল ছিল, সে পথের ধারে বনফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সাধের ভাঁড়ের কথা ভুলিয়া গেল।

তাহারা কিছু অধিক অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের সহিত নলিনের একজন সহপাঠী বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। সেই বালক কয়েকদিন তাহার পিতার পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে পারে নাই, এক্ষণে নলিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নলিন! আমার পিতা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, আমি কাল স্কুলে যাইব।" নলিন হেঁট মুখে বলিল "তা বেশ।"

দেবনাথ বলিল, "কেন তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে বিমর্ষ ও গম্ভীর দেখাইতেছে কেন? তুমি কি আজ স্কুলে

কোন মন্দ কাজ করিয়াছিলে ?" নলিন বলিল তা নয়, কিন্তু ভূপাল আজ বড় মন্দ কাজ করিয়াছে, সে কুন্দের ভাঁড়টি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।" দেবনাথ বলিল, "ভূপালের নিশ্চয়ই অতিশয় অন্যায় কাজ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমি বেশ বলিতে পারি, ভূপাল আপনিই আপনার মন্দ ব্যবহারের কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া নলিন রাগের ভরে বলিল, "আমি তাহাকে এর শাস্তি দিব। যদি সে আমার অপেক্ষা বলবান না হইত, তাহা হইলে আমি যাইয়া তাহাকে মারিতাম, কিন্তু যখন তাহা পারিতেছি না, আমি হয় তাহার নূতন লাঠিম ভাঙ্গিয়া দিব, না হয়———" "দেবনাথ বলিল, থাম, থাম, তোমার এ প্রকার বলা, বা এমন কি, ভাবাও উচিত নহে। তুমি কি জান না ইহাকেই প্রতিশোধ লওয়া অর্থাৎ খারাপের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা বলে ; কিন্তু আমাদের কি করা উচিত ? আমাদের 'অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা জয় করা উচিত'।" নলিন বলিল, "না, কেন আমরা স্কুলে কিছু দোষ করিলে শিক্ষক মহাশয় ত আমাদিগকে শাস্তি দেন?" দেবনাথ উত্তর করিল, "শাস্তি দেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য ; তুমি ভূপালের শিক্ষক নও, আর তা ছাড়া তুমি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে চাহ, কারণ তোমার একটি মন্দ ভাব রহিয়াছে এবং সেই ভাবকেই প্রতিহিংসা বলে।" নলিন কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিল ; পরে বলিতে লাগিল, "ভূপাল যদি আমার কোন অপকার করিত তাহাহইলে আমি,

তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার ভগ্নী কুন্দ ছেলে-মানুষ, তাহার ক্ষতি করিল কেন? কুন্দকে কেহ কষ্ট দিবে ইহা আমার অসহ্য"। দেবনাথ বলিল, "আচ্ছা তুমি যদি ভূপালের লাটিম ভাঙ্গিয়া দাও, তাহাহইলে তাহাকে কি কুন্দের প্রতি কি অপর কাহারও প্রতি সদয় বা ভদ্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে? আমার পিতা সে দিবস বলিতেছিলেন, আমাদের প্রিয় জনের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে ভালবাসা বড়ই শক্ত, কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়? আমরা যদি পরমেশ্বরের নিকট হইতে দয়া পাইতে ইচ্ছা করি, তাহাহইলে আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা উচিত।" নলিন প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল "আমার মনে হইতেছে যেন আমি ভূপালকে ক্ষমা করি।"—ইহা শুনিয়া দেবনাথ বলিল, "ভাল, তোমার এই যে সদিচ্ছা হইয়াছে, তাহা যাহাতে থাকে তাহার জন্য একমনে পরমেশ্বরকে ডাক; যাহার ইচ্ছা ভাল, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই কথা বলিতে বলিতে দেবনাথ আপনার বাড়ী যাইবার পথের মোড়ে উপস্থিত হইল, অতএব নলিনকে বলিল, "এস ভাই এস, আমি আজ চলিলাম।" নলিন একটীও কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কুন্দের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এদিকে কুন্দও পথপার্শ্বস্থ ফুল তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়াছে, ভাইয়ের হাত ধরিয়া অবশেষে দুজনে গৃহে পৌঁছিল। বাড়ী আসিয়াই কুন্দ মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল এবং তাঁহাকে মাটির ভাঁড়ের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু নলিন খানিকক্ষণ

দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার কারণ কি? সেকি এখনও কেমন করিয়া ভূপালের লাঠিম নষ্ট করিবে-তাহা ভাবিতেছে? না, কিরূপে সে নিজের রাগ থামাইবে তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে নলিন এক দিন স্কুলে যাইতেছিল। সে দিন কুন্দ শর্দ্দি হওয়াতে স্কুলে যাইতে পারে নাই। নলিন দূর হইতে শুনিল একটি বালক কাঁদিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল সেই বালক আর কেহই নয়, আগেকার চেনা লোক—ভূপাল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" ভূপাল মাথা তুলিয়া যখন দেখিল নলিন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তখন সে কিছু না বলিয়া অমনি মাথাটী নত করিল। নলিন পুনরায় মিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপাল তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে বল তোমার কি হইয়াছে!" নলিনের এই স্নেহের কথায় ভূপাল আর থাকিতে পারিল না, বলিল "আমি অতিশয় ক্ষুধিত, মা আমার কাল সকাল হইতে জ্বরে শয্যাগত আছেন এবং আমি এপর্য্যন্ত খাই নাই।" নলিন বলিল, "ভাই! আহা, তুমি কাল অবধি খাও নাই, ক্ষুধিত ত হইবেই; দেখ আমার কাছে একখানা ভাল রুটী আছে, আমি উহা তোমাকে দিতেছি।" ভূপাল বলিল, "এই রুটী তোমার নিজেরই আবশ্যক হইবে, ইহা তোমার সকাল বেলাকার খাবার!" নলিন তাহা দুখান করিয়া ক্ষুদ্র এক খণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া অপর খণ্ড ক্ষুধিত ভূপালের হাতে দিল। ভূপাল যদিও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোঁয়ার হইয়া উঠিত, তথাপি তাহার স্বভাব নিতান্ত খল ছিল না। এই জন্য নলিনের এই

দয়া তাহার বিলক্ষণ মনে লাগিল। সে বলিল, "আমি তোমার ছোট ভগিনীর উপর যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তাহা বিবেচনা করিলে আজি আমি কোন প্রকারে তোমার এই দয়ার যোগ্য নহি। বাস্তবিক কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার?" নলিন বলিল, "পারি। আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি আশা করি তুমি আর কথনও কুন্দের প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে না।" ভূপাল বলিল, "কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ প্রাতের এই ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।" সেই দিন হইতে বাস্তবিক ভূপাল তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল,—আর কথনও তাহার মুখ হইতে নলিন বা কুন্দের প্রতি কর্কশ কথা শুনা যায় নাই। তা ছাড়া অপরাপর বালক বালিকা-দিগের প্রতিও সে আর কথনও অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সেই দিন হইতে সে ভাল হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ভূপাল তাহার খুড়ীমার নিকট হইতে মেলায় খরচ করিবার জন্য একটী সিকি পাইয়াছিল। তখন সে আর কিছু না কিনিয়া সিকিটী দিয়া সেই ভগ্ন ভাণ্ডের মত একটী ভাঁড় কিনিয়া কুন্দকে দিল। ইহাতে কুন্দ বড় খুসী হইল। নলিন যে দেবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়াছিল ইহা কি নলিনের পক্ষে ভাল হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। প্রতিহিংসা বা রাগ হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। অপরে করুক বা না করুক, আমরা যেন কখনও কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিমুখ না হই।

"আহা, এক একটী ইন্দ্রিয় যে অনন্ত সুখের প্রস্রবণ, তাহা ত জানিতাম না।"

কোন সুখকর গ্রীষ্মের দিনে এন্ ডয়েল নামে এক বালিকা, তাহার খুড়ীমার সহিত নগর হইতে বাড়ী আসিতেছিল। ঐ খুড়ীমা এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ছাত্রী দিগের জন্য কয়েক খানা 'শ্লেট' ও বই কিনিতে সে দিন তিনি নগরে গমন করেন। তাঁহারা উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর যাইবার পর, এনের খুড়ী নগরের বহির্ভাগে আসিয়া অবধি এনকে একটীও কথা বলিতে না শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এন্, তুমি একেবারে নীরব কেন? তুমি কি কিছু ভাবিতেছ? এন্ বলিল, "হাঁ, খুড়ীমা, আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমরা যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অট্টালিকা অতিক্রম করিয়া আসিলাম, ইহাদের কোন একটীতে বাস করিলে এবং প্রচুর ধন থাকিলে আমাদের কত সুখ হইত! আমি মনোমত সামগ্রী কিনিবার জন্য দৈবাৎ কখনও এক আধ পয়সা পাই, আহা! অনেক ধন থাকিলে নগরের ঐ সকল দোকান হইতে কত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য কিনিতে পারিতাম।"

বালিকার এই কথা শুনিয়া তাহার খুড়ী বলিলেন, "এন্! আমি দুঃখিত হইলাম যে আজ প্রাতে আমার সহিত নগরে আসাতে তোমার মনে অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বৎসে, তুমি কি জান না, আমাদিগের যাহা কিছু আছে

সে সকলই পরমেশ্বর দিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে যাহা দেন, তাহা যে কেবল মঙ্গলের জন্য ইহাতে কি অণুমাত্র সন্দেহ আছে? একবার ভাব দেখি তিনি তোমাকে কি না দিয়াছেন? দেখ আজ কি সুন্দর দিন। আকাশ কেমন সুনীল, বায়ু কেমন সুখস্পর্শ, আহা! ঐ বেড়ার উপর কি সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে, আচ্ছা, আমি কিছু সময় অপেক্ষা করিতেছি, তুমি কতকগুলি ফুল মনের সাধে তুলিয়া লও, দেখিবে উহার জন্য তোমার মূল্য কিছুই দিতে হইবে না।" এন্ উত্তর করিল, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা ত নিশ্চয়ই সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার কি হইল, আকাশের শোভা দেখা বা ফুল জড় করা ত যে সে সকলেই করিতে পারে।"

এনের খুড়ী তখন সে বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না, বলিলেও বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহার উপদেশ স্থান পাইত না। সেই বুদ্ধিমতী শিক্ষয়িত্রী বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এনের মনকে প্রবল রূপে অধিকার করিয়াছে; অতএব সে অবস্থায় শত উপদেশ অপেক্ষা একটী উপযুক্ত দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ী হইবে এই বিবেচনা করিয়া তিনি বালিকাকে আর বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু পর দিন স্কুলের ছুটী হইলে তিনি এন্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "এন্, তুমি কি আজ আমার সহিত বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা কর?" এই কথা শুনিয়া এন্ অতিশয় আহ্লাদিত হইল, কারণ সে মনে করিল খুড়ীমার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া আবার অনেক ভাল ভাল জিনিষ পত্র দেখিয়া

আসিবে। তাঁহারা উভয়ে প্রায় এক মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পথপার্শ্বস্থ একটী সুপরিষ্কৃত কুটীরের নিকট পৌঁছিলেন। ঐ কুটীরের বহির্দ্বারে এক বৃদ্ধা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বালিকা মোজা বুনিতেছিল। এনের খুড়ী তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্ভাষণ করিলেন, "আজ বড় সুপ্রভাত বিবী ব্রাইয়েন্! আজ আমি তোমার পৌত্রীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইবে বলিয়া আমার ভাইঝিকে আনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ব্রাইয়েন্ তাঁহাকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক বলিলেন, "এনের সহিত আলাপ করা সুসেনের পক্ষে বড়ই সুখকর হইবে। আহা! হতভাগিনীর সংসারে অতি অল্পই আমোদ আছে। হায়! অন্ধ হওয়া কি বিষাদজনক! এ দিকে এন্ সুসেনকে অন্ধ দেখিয়া বলিল, "দুর্ভাগিনি বালিকে, তুমি কি অন্ধ? চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, ক্ষেত্র, পুষ্প বা মনুষ্যমুখ কিছুই দেখিতে পাওনা? তুমি কি চিরআঁধারের মধ্যে থাক?" সুসেন বলিল, "তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, আমি কিছুই দেখিতে পাই না। আজ কয়েক বৎসর হইল আমার দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়াছে।" এন্ বলিল, "আমি সত্যই তোমার জন্য সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। উঃ! চির অন্ধকারে থাকা কি ভয়ানক।"

সুসেন্ এনের এই শেষ বাক্যটী শুনিয়া বলিয়া উঠিল "না, না, তা কেন, আমার অন্ধকারের মধ্যে থাকা অভ্যাস হইয়াছে। তা ছাড়া, ঠাকুর মা বলেন, আমাদের

অসন্তুষ্ট না হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। আর তুমি ইহাও জানিও যে আমি দেখিতে পাই না সত্যবটে, কিন্তু আমি ত পাখীর মিষ্ট গান শুনিতে পাই, সেইরূপ সূর্য্যকে দেখিতে না পাইলেও তাহার সুখকর উত্তাপ সেবন করিতে পারি, অধিকন্তু ঠাকুরমার জন্য অনায়াসে মোজা বুনিতেও পারি।

'মোজা বুনিতে পারি' এই কথা শুনিয়া এন্ কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "না দেখিয়াও বুনিতে পার? আমি ত একটু একটু বুনিতে জানি, কিন্তু বেশ বলিতে পারি চক্ষু মুদ্রিত থাকিলে আমি কখনও ফাঁস দিতে পারিতাম না।"

সুসেন্ বলিল, "আমি স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা সেই প্রকার করিয়া থাকি। আমি ইহা অতিশীঘ্রও করিতে পারি, অভ্যাসে ইহা আমার পক্ষে সহজ হইয়া আসিয়াছে"। "উঃ! কত শীঘ্র শীঘ্র কাটা চলিতেছে! আমি আশ্চর্য্য হইতেছি, তুমি কিরূপে বুনিতেছ!" এই বলিয়া এন্ সুসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি নির্ব্বিঘ্নে চারিদিকে যাইতে পার, না, তোমাকে কেহ ধরিয়া লইয়া যায়?"

সুসেন্ বলিল, "আমাদের কুটীরের চারিদিকে আমি বেশ একা যাইতে পারি। আমি হাত বাড়াইতে বাড়াইতে যাই এবং দেয়াল ছুঁইলে কোথায় আসিলাম তাহা বুঝিতে পারি। পথে যাইতে হইলে পাছে আমার পদস্খলিত হয় এই হেতু ঠাকুরমা আমাকে ধরিয়া লইয়া যান। কিন্তু যদি কেহ আমার কাছ দিয়া যায়, তাহা হইলে আমি তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া জানিতে পারি।"

এন্ বলিল, "তবে তোমার কর্ণ ও হস্ত চক্ষুর কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু আমার বোধ হয় তুমি পড়িতে পার না।"

সুসেন্ বলিল, "তা কেমন করিয়া পারিব, আমি ত বর্ণ সকল দেখিতে পাই না।"

এন্ বলিল, "তবে তোমাকে যদি কেহ পড়িয়া শুনায় তাহা কি তুমি ভালবাস? আমার পুস্তকে কত মনোহর গল্প আছে। খুড়ীমা, আমি কি কোন কোন দিন স্কুলের ছুটীর পর সে সকল সুসেনকে পড়িয়া শুনাইতে পারি? আমি নিশ্চয় জানি, "ন্যানীব্রাউন ও তাহার মেষশাবক," "বসন্তঋতু" সম্বন্ধে কবিতা ইত্যাদি সুসেন্ শুনিলে কতই খুসী হইবে।"

এনের খুড়ী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি যে এ প্রকার চিন্তা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জগতের রাশিপ্রমাণ দুঃখের একবিন্দুমাত্র হ্রাস করিতে পারিলেও আমাদের জীবন কৃতার্থ হয়। যদি একটী মুখের কথায় কোন তাপিত প্রাণকে আমরা শীতল করিতে পারি, যদি কাতর ও বিষণ্ণ জনের চিত্ত কথাপ্রসঙ্গে অল্পমাত্রও বিনোদন করিতে পারি, যদি পীড়িতের নিকট বসিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাহার আরোগ্য লাভের সাহায্য করিতে পারি,এইরূপ জগতের মঙ্গলের জন্য যদি প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন দেবভাবাপন্ন ও মধুময় হয়।"

এন্ ও তাহার খুড়ীমা সে দিন সুসেন ও তাহার ঠাকুরমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণানন্তর সময়ান্তরে আসিয়া পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিব বলিয়া চলিয়াগেলেন। পথে যাইতে যাইতে

এনের খুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এন্ তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি কি বালিকা সুসেন্‌কে ভালবাস?

এদিকে এন্ সেদিন নগর হইতে বাড়ী আসিবার সময় পথিমধ্যে আপনার ভাগ্যের প্রতি যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিয়া খুড়ীকে করুণস্বরে বলিল, “হায়, হায়, আমি কি অকৃতজ্ঞ,চক্ষু প্রভৃতি“এক একটী ইন্দ্রিয় যে অনন্ত সুখের প্রস্রবণ, তাহা ত জানিতাম না।”

এনের খুড়ী যখন দেখিলেন যে বালিকা আপনা হইতেই এই অমূল্য সত্য বুঝিয়াছে, উপদেশে যাহা করিতে পারে নাই একটী সৎ দৃষ্টান্তে তাহা করিয়াছে, তখন তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না, তথাপি তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, ঐ যে তুমি বলিলে, “এক একটী ইন্দ্রিয় অনন্ত সুখের প্রস্রবণ” ইহাই বুঝাইবার জন্য আমি তোমার সহিত তর্ক যুক্তি পরিহার করিয়া তোমাকে বিবী ব্রাইয়েনের কুটীরে লইয়া গিয়াছিলাম। তুমি যে আমাকে সে দিবস বলিয়াছিলে “চন্দ্র সূর্য্য পুষ্পাদি ত সকলেই দেখে, ইহাতে আর বিশেষ সুখ কি আছে?” কিন্তু এখন ত বুঝিতে পারিলে যে, তুমি যে সমস্ত পদার্থ অগ্রাহ্য করিয়াছিলে, সেই সকল অন্ধ বালিকা সুসেনের পক্ষে কত দুর্লভ ও প্রিয়দর্শন। অতএব হে ক্ষুদ্র বালিকে, তুমি আপনার ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর। পৃথিবীর অবোধ লোকের ন্যায় বলিও না যে সংসার কেবল দুঃখ ও নিরানন্দময়, জানিও আনন্দময় ঈশ্বর আনন্দের খনি আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন। প্রফুল্লচিত্তে আপনার অবস্থানুরূপ কার্য্য করিয়া যাও, সেই মধুর আনন্দ লাভ করিয়া চির সুখী হইতে পারিবে।

—ঃঃ—

"অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ ধর্ম্মাধ্যয়নকর্ম্মসু।"

ধন্য সেই মহাত্মা যিনি এই মহামূল্য বচনটী মূলমন্ত্ররূপে পরিগ্রহ করিয়া আপনার জীবনকে নিয়মপরতন্ত্র করিতেছেন। ধন্য তিনি, যিনি মানব জীবনের গুরুতর মহত্ত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিয়া একটী দিবসও বিফলে অতিবাহিত হইতে দেন না, এবং কোন দিন বিফলে অতিবাহিত হইলেও যিনি মহাত্মা টাইটসের ন্যায় দৈনন্দিন কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার সময় কাতর হৃদয়ে বলিতে পারেন, "হায়, হায়! একটী দিবস বৃথা নষ্ট করিয়াছি।" ধন্য তিনি, ধর্ম্ম যাঁহার শিরোভূষণ, অধ্যয়ন যাঁহার প্রিয়তম কার্য্য, এবং কর্ম্ম যাঁহার প্রাণ। ধন্য সেই পরিবার, যেখানে ধর্ম্ম অধ্যয়ন ও কর্ম্মের ভাব নিয়ত জাগ্রত রহিয়াছে। যেখানে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী হইতে সামান্য পরিচারক পরিচারিকা পর্য্যন্ত সকলেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত, যেখানে গৃহের গৃহদেবতা পরমেশ্বরের পরম পবিত্র সিংহাসন হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, এবং সকলের মস্তক সেই দেবতার সম্মুখে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও ভক্তিতে অবনত, যেখানে সকলেই অধ্যয়ননিরত, জ্ঞানপিপাসু, যেখানে সকল প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার ও অসত্যের অন্ধকার জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তিরোহিত হইয়াছে, যেখানে সকলেই কর্ম্মঠ, সকলের দৃষ্টি ও প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন জীবন্ত ভাবের পরিচায়ক, আলস্য যেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত যেখানে সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন। ধন্য সেই সমাজ যেখানে সকলেই সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়া সংসার-স্থিতি-ভঙ্গ-নিবারক সমাজপতি জগদীশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া

স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকেন, কেহ কাহারও কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করেন না। জীবশরীরে যেরূপ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ অঙ্গ—সকলেই জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ সমাজশরীরের অঙ্গসদৃশ প্রত্যেক নরনারী সমাজ দেহকে সুস্থ ও সবল রাখেন। পরিশেষে ধন্য সেই সাম্রাজ্য যেখানে রাজসিংহাসন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ক্ষমতা যথাযোগ্যরূপে পরিচালিত হয়। এইরূপ হইলে সমগ্র দেশটী এক প্রকাণ্ড সুচারু যন্ত্রের ন্যায় নিয়ত সুশৃঙ্খলে চালিত হইতে থাকে।

রিপু দমনের উপায়।

১। পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ স্থাপন করিবার চেষ্টা। "প্রেমময় ঈশ্বরকে দৃঢ়প্রেমে আবদ্ধকর, রিপুর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।"

২। মৃত্যু ও পার্থিব বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা চিন্তা করা।

৩। ধর্ম্মজীবন যাপনের বিমল স্বর্গীয় আনন্দ স্মরণ করা।

৪। অসাধুভাব, অসাধুগ্রন্থ ও অসৎসংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করা। যাহাতে বিলাস বৃদ্ধি করে, সে সকল বিষয় হইতে দূরে থাকা। অসাধুভাব উদয় মাত্র তাহাকে দূর করিবার জন্য কাতর হৃদয়ে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা আর কুচিন্তার উদয় হইলে ক্ষণকাল মাত্র পোষণ না করিয়া প্রাণগত চেষ্টা দ্বারা তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা।

৫। কুচিন্তার উদয়মাত্র কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট দৌড়িয়া পলায়ন করা।

৬। পিতা মাতা ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের নিকট অধিক ক্ষণ থাকা। সরল শিশুর সহিত সময়ে সময়ে ক্রীড়া করা।

৭। প্রকৃতির শোভা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে পুষ্পো-দ্যান নদীর তীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করা।

৮। সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা।

৯। কোন একজন ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়াছেন, "স্ত্রীজাতির মুখশ্রী দর্শন করা পুরুষের একটী উচ্চ অধিকার। পদ দর্শন করিবে, তাহা হইলে বিনয় শিক্ষা হইবে। জিতরিপু হইলে নারীগণের মুখ দেখিবে, তখন জগন্মাতার আভাস অন্তরে প্রাপ্ত হইবে।" মহাত্মা ঈশা বলেন যে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি করিলেই অন্তরে তাহার সহিত ব্যভিচার করা হইল, অতএব পবিত্রভাবে স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। "মাতৃবৎ পর দারেষু"—ইহা একটী অমূল্য নীতি।

সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।

এক বিদ্যার্থী দরিদ্র যুবক কোনও অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য অনেক দূর পদব্রজে গমন করেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরিশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইলে তিনি আপনার দীনতা জানা-ইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালে ছাত্র সংখ্যা পূর্ণ থাকাতে তাঁহার

স্থানাভাব হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ঐ যুবকের সকরুণ প্রার্থনা কিরূপে অগ্রাহ্য করিবেন, স্পষ্টাক্ষরে "তোমার এখানে স্থান হইবে না," এই বলিয়া কিরূপে তাহাকে বিদায় করিয়া দিবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি এক উপায় অবলম্বন করিলেন। একটা পাত্র এরূপে জলপূর্ণ করিলেন যে তাহাতে আর বিন্দু মাত্র জল থাকিবার স্থান রহিল না এবং তৎপরে অধ্যক্ষ মহাশয় পূর্ণনীরপাত্র নীরবে যুবকের সম্মুখে ধারণ করিলেন। যুবকও এই সঙ্কেতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে বিমুখ হইলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল, তিনি একটী শুষ্ক ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্র কুড়াইয়া লইলেন এবং পশ্চাতে ফিরিয়া ঐ পাত্রস্থ জলের উপর রাখিয়াদিলেন। এই ঘটনা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির অব্যর্থ উপায় স্বরূপ হইল। তিনি অবিলম্বে বিনা আপত্তিতে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বাস্তবিক যাঁহাদের সঙ্কল্প সাধু ঈশ্বর তাঁহাদের সহায় হন, তাঁহারা এই রূপেই পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু পত্র যেরূপ পূর্ণনীর পাত্রের উপর ভাসিয়াছিল সেইরূপ অবিরোধে থাকা আবশ্যক।

এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা হইতে একটী অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।—"সাধু যাঁহার সঙ্কল্প ঈশ্বর তাঁহার সহায়"— যিনি যত কেন প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হউন না, যত কেন বিফল প্রযত্ন হইয়া নিরাশার অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হউন না নিরুপায়ের উপায়, আশার জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য বিধান যে তাহাকে চিরদিন দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিতে হয় না। অতএব "সাধু যাঁহার সঙ্কল্প ঈশ্বর তাঁহার সহায়" এই

সত্যের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহাদের জীবন সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে ও যাঁহারা অন্তরে সাধু সঙ্কল্প পোষণ করেন, তাঁহাদের নিরুদ্যম হইবার কোন কারণ নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই সফল মনোরথ হইবেন।

মনোযোগ সাধন।

মহাভারতে কথিত আছে যে, দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরাদি রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষাপরীক্ষার্থ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কোন সুনিপুণ শিল্পী দ্বারা এক কৃত্রিম পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্র শাখায় আরোপিত করেন। ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে পারিলেই শিষ্যগণের পারদর্শিতা প্রমাণিত হইবে।

প্রথমে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্যের নিদেশানুসারে লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; "লক্ষ্যবিদ্ধ কর" এই বাক্যের অবসান না হইতে হইতেই শরসন্ধান করিতে হইবে। তখন দ্রোণাচার্য্য কহিলেন,—"তুমি বৃক্ষের অগ্র শাখায় ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর"—যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ আমি দেখিতেছি"। আচার্য্য পুনরায় বলিলেন, "এখন তুমি কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কেন, আমি সমীপবর্ত্তী বৃক্ষকে, আপনাকে, আমার ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছি" এই কথা শুনিয়া আচার্য্য অপ্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না।

পরে, ক্রমান্বয়ে দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এবং অর্জ্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠির প্রমুখ অন্যান্য ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আচার্য্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার অভিপ্রেত সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে, দ্রোণাচার্য্য ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলেন, "বৎস! এইবার তোমাকে এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জ্জুন ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আচার্য্যের আদেশাবসানে লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন। তখন দ্রোণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বৃক্ষকে, পক্ষীকে, না আমাকে বা তোমার ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ? এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "না গুরো! শরব্য পক্ষী ভিন্ন আমার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।" আচার্য্য প্রীত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সমগ্র পক্ষি-শরীর দেখিতেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি পক্ষীর মস্তক ভিন্ন অবশিষ্ট কলেবর কিছুই দেখিতেছি না। ইহাতে আচার্য্য অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া "তবে লক্ষ্য বিদ্ধ কর" এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পক্ষীকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত অখ্যায়িকায় আমরা দেখিতে পাই একমাত্র অর্জ্জুন কেবল লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া পক্ষীকে ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হইলেন, আর অপরাপর রাজকুমারগণ নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করাতে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেইরূপ আমরা যে কোন উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করি না, তাহার মূলে একাগ্রতা ও পূর্ণমনোযোগ

অতিশয় প্রয়োজনীয়। নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সমাহিত করিতে না পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা কোথায়?

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে মনের একাধার আছে। জড়বস্তু সকল যেমন স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে স্থানাবরোধকতা ধর্ম্মপ্রযুক্ত অন্যান্য বস্তুর অবস্থিতির অবরোধ জন্মায়, সেইরূপ একাধারবিশিষ্ট মনও এক সময়ে এক বিষয় সম্যকপ্রকারে চিন্তা করিতে সক্ষম এবং এক চিন্তার বিরাম না হইলে অপর চিন্তা মনকে অধিকার করা সম্ভব নহে। শিশুদিগের মনের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা যখন কোন বস্তুর প্রতি চাহিয়া থাকে বা কোন শব্দ শ্রবণ করে, তখন তাহাদিগের মন দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয়ে এতদূর সংযত হয় যে, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে আমাদিগের মন এক সময়ে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কারণ পরম্পরাক্রমে দ্রুত চিন্তা করিবার অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সেই অভ্যাসই কালে দ্বিতীয় স্বভাবের ন্যায় বোধ হয়। এই প্রকার ক্ষিপ্রচিন্তার ক্ষমতা হইলেও কেহ বলিতে পারেন না যে এক সময়ে মন অনেক বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম। যেমন একটা গোলা এক খণ্ড রজ্জুর প্রান্তভাগে বান্ধিয়া বেগে ঘূর্ণিত করিলে শূন্যে যে বৃত্তাকার রেখা পড়িতে থাকে, তাহা সমকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে; সেই প্রকার চিন্তার দ্রুত পারম্পর্য্যবশতঃ সমকালে মন অনেক বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম বলিয়া ভ্রম হওয়াও বিচিত্র নহে।

মনের এই প্রকার প্রকৃতি হেতু, কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদের সেই বিষয়ের প্রতি অবিভক্ত মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে যিনি বিষয়ান্তর হইতে মন প্রত্যাহার করিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘকাল অভিনিবেশ করিতে পারেন, তিনি সেই বিষয়ে সহজে অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন। অপরন্তু যাঁহার মনের একাগ্রতা নাই, কেবল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাঁহার মন নিয়ত পরিভ্রমণ করে, তিনি কখনও তাদৃশ ফল লাভ করিতে সক্ষম হন না। মনঃসংযোগের এই প্রকার তারতম্য প্রযুক্ত জ্ঞানের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে; যে ছাত্র অধিক পরিমাণে পাঠের প্রতি মনোনিবেশ করিতে শিখিয়াছে, সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও অনায়াসে পাঠ আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু অনাবিষ্ট ছাত্র সেরূপ কখনই পারে না।

এক্ষণে, মনোযোগ সাধনের দুই একটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে:—

১ম। যাঁহার যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহার সেই বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ হওয়া স্বাভাবিক। ক্রীড়াসক্ত বালকের মনে ক্রীড়ার বস্তু যেমন স্থান পায়, পাঠ্যপুস্তক অথবা শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য বিষয় তাদৃশ স্থান পায় না। অতএব প্রথম উপায়, অবলম্বিত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ স্থাপনের চেষ্টা। ইহা করিতে হইলে মনের দৃঢ়তা আবশ্যক। একবার লক্ষ্য স্থির করিয়া যদি তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে চেষ্টা করা যায়, প্রথম প্রথম এই সাধন কিয়ৎপরিমাণে কষ্টকর হইলেও সময়ে সুখকর

হইবে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অভ্যাসের ক্ষমতা এত অধিক যে ইহা স্বভাবকেও কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিতে-পারে। বহুদিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াও প্রথমে কিছুদিন স্বাধীনতা সুখের আস্বাদ পায় না। তাহার পক্ষে কারাগৃহের রুদ্ধ বায়ু যেন মুক্তগগণের মুক্তবায়ু অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিকর।

২য়। যাঁহার মন যে পর্য্যায়ে উন্নত হইয়াছে, তাঁহার মন সেই পর্য্যায়ের উপযোগী বিষয়ে অধিক সংযত হয়। ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মনে সাংসারিক বিষয় যে প্রকার স্থান পায়, ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ বিষয় তাদৃশ স্থান পায় না। ভাবুক কবি স্বভাব-সৌন্দর্য্যে যেমন মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন,চিন্তাবিহীন লোক সেই শোভায় তাদৃশ মনোনিবেশ করিতে পারে না। অতএব মনের পর্য্যায়মত কার্য্য অবলম্বন করা মনোযোগ সাধনের অন্যতর প্রধান উপায়।

৩য়। অবলম্বিত হিতকর কার্য্যের শেষদিন স্মরণ করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করা মনোযোগ সাধনের আর একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কাজ করিতে করিতে চিত্ত বিচলিত হইতে পারে, কিন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খল মনকে স্ববশে আনিতে হইলে, শেষ ফলের প্রতি আশান্বিত হইয়া দৃষ্টিকরিতে হইবে। যদি উদ্যম ও পরিশ্রম শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে, তাহা ঐ আশার সংযোগে আবার শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

জ্ঞান-সাধন।

বাইবেলে বর্ণিত আছে, ডেভিডের পুত্র সলোমন্ পিতার মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রভু পরমেশ্বরের পূজার্থ জিবিয়ান্ নামক স্থানে গমন করেন। রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় জগদীশ্বর সলোমনের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন "আমি তোমাকে কি দিব, প্রার্থনা কর।" তরুণভূপতি পার্থিব ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা না করিয়া বলিলেন, "প্রভু, তুমি যখন কৃপা করিয়া এ দাসকে অসংখ্য প্রজাবৃন্দের অধীশ্বর করিয়াছ তখন আর কি চাহিব, যাহাতে সত্য ও অসত্য নির্ণয় করিয়া এই অসংখ্য প্রজাপুঞ্জকে সুশাসনে রাখিতে পারি, আমাকে এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান দেও।" এই কথায় পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি ধন মান দীর্ঘজীবন শত্রুকুলধ্বংস এ সকল না চাহিয়া প্রকৃত জ্ঞান ভিক্ষা করিলে, আমি তোমাকে প্রার্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞান ত দিলাম এবং তদ্ভিন্ন তুমি, ধনমানাদি যাহা প্রার্থনা কর নাই, তাহাও অযাচিতভাবে প্রাপ্ত হইলে, এবং যদি তুমি আমার সেবক, তোমার পিতা, ডেভিডের ন্যায় সত্য ও ন্যায় পথে চল, আমি তোমাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করিতেও ক্ষান্ত থাকিব না"।

সলোমন জাগ্রত হইলেন। জেরুজালেমে প্রত্যাগত হইয়া প্রভু পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনা করিয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকে ভোজ দিলেন। তৎপরে ক্রমে তাঁহার গভীর জ্ঞান প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিন সহস্র জ্ঞানগর্ভ বচন এবং পঞ্চাধিক সহস্র সংগীত তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। সলোমনের

সমকালবর্ত্তী কত শত নৃপতি ছিলেন, কিন্তু আজি তাঁহারা কোথায়? জগতে কি তাঁহাদের নাম ঘোষিত হইতেছে? সভ্য-সমাজের ইতিহাসে হয় ত তাঁহাদের নাম লিখিত থাকিতে পারে, কিন্তু জগৎ কি কোন কালে তাঁহাদের স্মৃতি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বোধে বিস্মৃতির অতলজল হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়াছে? বাস্তবিক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মনুষ্যকে অমর জীবন প্রদান করিতে পারে না।

সলোমনের কথা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে জ্ঞানের প্রকৃতি ও অন্যান্য উপকারিতা আলোচনা করা যাউক। বহির্জ্জগতে সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ যে প্রকার জগতের যাবতীয় অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয়, অন্তর্জ্জগতে জ্ঞানজ্যোতিঃও সেইরূপ সকল প্রকার ভ্রমান্ধকার তিরোহিত করে। রাত্রিকালে যখন ধরা অন্ধকারাবৃত হয়, তখন যেমন কোন বস্তু সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতে জ্ঞানালোকের অভাবে সত্য নির্ণয় করা দুষ্কর এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রকৃততত্ত্বে কোন বিষয় দর্শন বা অনুচিন্তন করিতে হইলে এই আলোক বা জ্ঞানই একমাত্র সহায়। জ্ঞান অঞ্জনের ন্যায় চক্ষুর দর্শন শক্তি বর্দ্ধিত করে। অজ্ঞানীর চক্ষু যেখানে স্থূল বহিরাকার দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, জ্ঞানীর নেত্র সেই স্থূল বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়ভাবে সেখানে প্রবেশ করে। অজ্ঞানীর পক্ষে যে স্থান শূন্য, জ্ঞানীর পক্ষে সেই স্থান পূর্ণ। জ্ঞান আলোকের ন্যায় আমাদের জীবনপথের প্রদর্শক হয়; জ্ঞান আমাদিগকে দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান করে, জীবনসংগ্রামে ইহাই আমাদের

অন্তরে অমিত বল সঞ্চার করে এবং পাপাসুরকে পরাস্ত করিয়া আমাদের মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দেয়। সর্ব্বোপরি এই জ্ঞান আমাদিগকে দেবাভরণে ভূষিত করিয়া সকল প্রকার অসত্য, অন্যায় ও ভ্রমান্ধকারের পরপার সেই জ্ঞানময় প্রভু পরমেশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যায়।

বহির্জ্জগতে জ্ঞান কি কি মহৎকার্য্য নিয়ত সংসাধিত করিতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া বিবৃত করিতে হইলে এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবর পরিপূর্ণ হইয়া যায়; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে সভ্যতার পরিপোষক শিল্পের সাহায্যে যে কিছু অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের মূল দেশে এই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়া আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিতেছে।

একণে, জ্ঞান সাধনের কয়েকটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে:—

১ম। প্রকৃতি-সঙ্গ।

২য়। লোক-সঙ্গ।

৩য়। গ্রন্থ-সঙ্গ।

মানব মনে জ্ঞান লাভের বাসনা স্বভাবতঃ অত্যন্ত বলবতী। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে কয়েকটী বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানলাভের দ্বার স্বরূপ। ইহাদিগের মধ্য দিয়া মানব জ্ঞানোপার্জ্জন করে। মানব-শিশুর নিমীলিত নেত্রে যে দিবস প্রথমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করে, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, সে জ্ঞানের আর পরিসমাপ্তি নাই। জ্ঞানের জলধি মধ্যে দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকিয়াও মানবের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হইবার নহে, এ দারুণ পিপাসা অনন্ত জ্ঞানের উৎস

একমাত্র ভূমা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই মিটাইতে পারেন না। ক্ষুদ্র শিশুর মনে যখন জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হইতে থাকে, তাহার গতি অনুসরণ করা কেমন সুখকর! শিশু জিজ্ঞাসু হইয়া যখন জনক কি জননীর বক্ষে উঠিয়া "এটা কি" "ওটা কি"? প্রভৃতি মধুমাখা প্রশ্ন করিতে থাকে তাহা কি মধুর! শিশুর ইন্দ্রিয়গোচর জগতের তাবৎ পদার্থ অভিনব, সেই জন্যই স্বভাবতঃ সে ঐরূপ প্রশ্ন করে। ধন্য সেই দেশ যেখানে শিশু তাহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া অনুদিন বয়সে ও জ্ঞানে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে শিশু বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রকৃতি ও লোকসঙ্গ হইতে বিস্তর জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে থাকে।

উন্নতিপ্রাপ্ত সভ্য সমাজে জ্ঞানলাভ করিবার আর একটী প্রকৃষ্ট উপায় প্রচলিত আছে, যাহা উপরে "গ্রন্থসঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে। চিন্তাশীল জ্ঞানীগণ প্রকৃতিকে পর্য্যালোচনা করিয়া এবং লোক চরিত্র অবগত হইয়া যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা পাঠ করিলে যে জ্ঞান লাভ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থসঙ্গ যে বিদ্যালাভের অমোঘ সহায় ইহা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ ইহা এতদূর প্রমাণিত হইয়াছে যে অনেকেই মনে করেন যে গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন শিক্ষা রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্য পথ নাই। তাঁহাদের এতদূর বিশ্বাস, যিনি এই পথ অনুসরণ না করেন তিনি "বিদ্বান" নামের যোগ্য নহেন। কিন্তু সামান্য বিচার করিলে ইহা দৃষ্ট হইবে যে শিক্ষার পক্ষে গ্রন্থ এক অত্যাবশ্যক উপায় বটে, কিন্তু এক মাত্র উপায় কথনই নহে। জনসমাজ ও

প্রকৃতিরূপ সুবিশাল গ্রন্থ মানবের শিক্ষার কার্য্য নিয়ত সম্পাদন করিতেছে।

অতএব সকল শিক্ষার্থীকে উপরের নির্দ্দিষ্ট তিনটী উপায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। সর্ব্বদা জ্ঞানপিপাসু হইয়া অপ্রমত্তভাবে, পূর্ণ মনোযোগের সহিত প্রকৃতিকে আলোচনা করিতে হইবে। প্রকৃতিকে রাখিয়া লোক-চরিত্র অবগত হইতে হইবে এবং লোক-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে।

শিশু-জীবন।

পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন পার্থিব নহে, এপ্রকার পদার্থ যদি কেহ দেখিবার অভিলাষী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি মাতৃক্রোড়শায়ী শিশুসন্তানের প্রতি চাহিয়া দেখুন। তাহার নবনীত-পরাজিত কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কেমন লাবণ্যময় ও নয়নানন্দকর; শারদকৌমুদীনিভ সুনির্ম্মল হাস্য শিশুর ঈষৎ রক্তাভ অধরে ও নয়নের কোণে প্রস্ফুটিত; সমগ্র বদনমণ্ডল সুমধুরভাবে পরিপূর্ণ; প্রত্যেক হস্তপদ সঞ্চালন ও বিস্ফারিত দৃষ্টি হৃদয়ের গভীর আনন্দব্যঞ্জক। সংসারের মলিন অপবিত্রতা এখনও শিশুকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করে নাই; পৃথিবীর কঠোরতা, দুশ্চিন্তা এখনও শিশুর কোমল পবিত্র ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই; কমলাননের প্রফুল্লতা বা হীরকোজ্জ্বল নয়নের সরলতা এখনও ঘনবিষাদের কালিমায় ও সংসারের

কুটিলতায় মলিন হয় নাই, হৃদয়মুকুরের নৈসর্গিক স্বচ্ছতা এখনও পাপের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। সেই স্নেহের পুত্তলিকা, আনন্দের ছবি এখনও গৃহকে উৎসবপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন—এমন কি নিঃসম্পর্ক দর্শকগণেরও আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, শোক-সন্তপ্ত চিত্তকে সুশীতল এবং উদাস প্রাণকে স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ করিয়া সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। শিশু এখনও আত্মপর ভাবনা শিক্ষা করে নাই, তাহার ভালবাসা এখনও স্বার্থে পরিণত হয় নাই, নিরাশা দুঃখ দারিদ্র্যের ভীষণমূর্ত্তি এখনও শিশুর চিত্তের শান্তি হরণ করে নাই, যশোলিপ্সার মোহিনী মূর্ত্তি এখনও তাহার চিত্তকে চঞ্চল বা বিপথগামী করে নাই। অর্থ গৃধ্নুতার কুহকে পড়িয়া হা অর্থ! হা অর্থ! করত গৃহ-প্রাঙ্গণ-বিচরণ-শীল শিশুর ক্ষুদ্র পদ-যুগল যোজনশতপথ অতিক্রম করিতে শিক্ষা করে নাই, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল দুস্তর জলধি বক্ষে তরণী ভাসাইয়া দিন যামিনী ক্ষতি লাভের গুটিকা গণনা করিতে করিতে ধন-দেবতার উপাসনায় এখনও শিশুর প্রাণ মন নিয়োজিত হয় নাই। শিশুর এখনও সকলই কমনীয়, সকলই মনোমত, সকলই প্রেমপ্লুত।

এমন কে আছেন যে এ প্রকার শিশুরত্নকে দেখিতে আর তাহার অসামান্য রূপ-রাশিতে মগ্ন হইয়া তাহার দেবভাব চিন্তনে সময়ে সময়ে প্রাণ মনকে সুখসাগরে ভাসাইতে ইচ্ছা না করেন? মনোমধ্যে এই সকল ভাবিয়া আর কি কেহ শিশুকে মর্ত্ত্যজীব বলিতে সাহসী হইবেন? আমরা কলঙ্কী, পাপ তাপে তাপিত, বিষয় মদে মত্ত, নিকৃষ্ট স্বার্থপরায়ণ, প্রবল সাংসারিকতায়

নিমগ্নচিত্ত, আমাদের মধ্যে স্বর্গীয় শিশুকে সামান্য চক্ষে দেখিয়া তাহাকে কি পাঁচজনের একজন বলিয়া ভাবিব? না—তাহা হইতেই পারে না। আমরা তাহাকে পৃথিবীর অতীত স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া ভাবিব এবং তাহা হইতে আমাদের জীবনের শিক্ষা লাভ করিব।

কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াছেন যে, দয়াময় ঈশ্বর মানবকে স্বর্গের পথ, স্বর্গের শোভা দেখাইবার জন্য যেন সময়ে সময়ে এক একটী বিশেষ পদার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আমাদের আনন্দ ও শিক্ষা লাভ হয়, আর তাহা যেন এ জগতের অতীত বলিয়া বোধ হয়। যথা, বসন্তের সমীরণ, শরতের শশী, সুন্দর সুগন্ধি কুসুম, বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠধ্বনি, শিশুর সহাস্য বদনমণ্ডল ইত্যাদি। বাস্তবিক আমরাও একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, সত্যই শিশু এজগতের অতীত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। আর তাহার প্রফুল্লতা সরলতা প্রভৃতি রাশি রাশি দেবভাব, পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর—এমন কি ঘোর বিষয়ীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করত স্বর্গের পথ ও স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যেন সঙ্কেত করিতেছে।

শিশু কি প্রকার, তাহা কতক বুঝিলাম। তাহার জীবন পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, জরায়ুবন্ধন বিমুক্ত হইলে শিশুর উন্মীলিত নেত্রে যখন প্রথম আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট হয়, অমনি শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে। স্বাভাবিক তেজঃকান্তিতে অরিষ্ট-শয্যা আলোকিত হয়, শিশু আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী দর্শক সকলেরই মনোহরণ করে, সকলের

যত্নে ও আদরে শশিকলার ন্যায় অনুদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। দেখিতে পাই কখন বা শিশু জননীর অঙ্ক-শয্যায় শয়ান হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অনন্ত প্রসারিত গগণমণ্ডলে চন্দ্র দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করে, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে থাকে। এই হাস্য বড় সরল ও মধুর। শিশুর অধরের এই বিমল হাস্য যদি তুলনায় বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শরতের সুনীল আকাশের পানে তাকাইয়া পূর্ণশশীর বিমল সৌন্দর্য্য-সাগরে মগ্ন হই, অথবা কোন নিভৃত প্রদেশে বিকসিত কুসুমটীর পানে নেত্রপাত করিয়া থাকি, মৃদু মৃদু পবন-হিল্লোলে পুষ্পটী হেলিতেছে দুলিতেছে, নাসিকার তৃপ্তিকর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, ইহাই মনে মনে ধ্যান করি। প্রকৃতির এই দুইটী দৃশ্য, যাহা কল্পনা করিলেও মনোমধ্যে কত শান্তি ও আনন্দের লহরী উঠিতে থাকে, যদি কেহ কখন দর্শন এবং অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শিশুর পবিত্র মুখমণ্ডলে চিত্তবিনোদন হাস্যের কতক আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। দেখিতে পাই, শিশু মাতার ক্রোড়স্থ হইয়া কখন বা হস্ত প্রসারণ করিতেছে, কখন বা জননীর বস্ত্রাঞ্চল টানিতেছে, কখনও বা স্বীয় অঙ্গুলি লেহন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিশুর বাক্‌শক্তির উদয় হয়, প্রথমে অস্ফুট ধ্বনি "ওয়াঁ" শব্দ এবং ক্রন্দন ভিন্ন শিশু আর কিছুই জানে না, ক্রমে আধ আধ স্বরে মা, মা, বা, বা ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করিতে শিক্ষা করে। তাহার পরে দেখি শিশু অল্পে অল্পে দুই একটী করিয়া কথা উচ্চারণ

করিতে থাকে। ভাষা-তত্ত্বানুসন্ধায়ী-পণ্ডিতগণ শিশুর এই স্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিজ্ঞানের অতি গভীর তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন। শিশুর গতি ক্রিয়া শিক্ষাপ্রণালীও সামান্য আশ্চর্য্য নয়। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন এই সকল অবতারের অভিনয় করিয়া শিশু দ্বিপদের উপর ভর দিয়া চলিতে থাকে। শিশুর হস্ত পদে যখন একটু বল সঞ্চার হইয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? সে এক্ষণে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বানুবর্ত্তী হইতে শিখিয়াছে, গৃহের মধ্যে এঘর ওঘর করিতে শিখিয়াছে, অনুসন্ধান প্রবৃত্তির দিন দিন পরিচালনা ও স্ফূর্ত্তি হইতেছে। এ জগতের যাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, সে সকলই শিশুর চক্ষে নূতন, সুতরাং আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পশু, পক্ষী, সকলই শিশুর চক্ষে অতিশয় প্রিয়দর্শন। এক্ষণে শিশু জননীর ক্রোড়ে বসিয়া বা জনকের বক্ষঃস্থলে উঠিয়া "এটা কি?" "ওটা কি?" ইত্যাদি মধুমাখা কথায় সকলকে মোহিত করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার কত ভাবোদয় ও জ্ঞান সঞ্চারের সূত্রপাত হয়! এই যে অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ হইল, ইহাকেই শিশুর শিক্ষা ও উন্নতির মূলীভূত কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে মানবের এই প্রবৃত্তির অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে! শিক্ষার পর শিক্ষা উন্নতির পর উন্নতি, তবুও এই শিক্ষা এই উন্নতি ফুরায় না,—দ্রষ্টব্য যাহা দেখিল, চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি লাভও করিল, কিন্তু তবুও দর্শন স্পৃহা

চরিতার্থ হইল না;—চিন্তিতব্য যাহা তাহা চিন্তা করিল, তবুও চিন্তার বিরাম নাই;—আকাশ পাতাল, চন্দ্র সূর্য্য, জীবন মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, বিপদ সম্পদ, পাপ পুণ্য সকলই চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় হইল, কত শত প্রকৃতির নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তবুও অসীম জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি নাই। চিরউন্নতিশীল আত্মার সমুদ্রশোষী পিপাসা কি কখন শিশির-বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? অমৃতধামের যাত্রী যাহারা তাহারা কি পার্থিব বিষয় সকল, যাহার সম্বন্ধ জীবের মৃত্যুর সহিত বিচ্ছিন্ন হয়, চির দিন সেই সকলকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিবে? যাহাহউক এ বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজনাভাব। পরন্তু এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি যে উন্নতিমূলক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কারণ এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও জ্ঞানের উদ্বোধ না হইলে প্রকৃত পক্ষে বস্তু বা ব্যক্তির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। অতএব শিশুকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক, কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন এই বাল্য শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য যে আমরা শুদ্ধ শিক্ষক সমীপে পুস্তকাধ্যয়ন করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করিতেছি না, পরন্তু বাল্যকালে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বা প্রতিবেশী বর্গের আচার ব্যবহার যাহা শিশু প্রতিনিয়ত দেখিতে থাকে বা শুনিতে পায়, সে সকল বিষয়ই শিক্ষার কার্য্য করিতে থাকে। আমরা দৈনিক জীবনে বা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাধু মহাত্মাদিগের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দর্শন বা

পাঠ করিয়া যে মুগ্ধ হই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সকলের মূলে শিক্ষার দিকেই আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। আমরাও অনেক সময় দেখিয়াছি যে গৃহে পিতা মাতা পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি ও পুণ্যের শুভ্র জ্যোৎস্নাতে বিমণ্ডিত হয়। ইহার অন্যথা হইলে শিশু অপবিত্রতা শিক্ষা করিয়া গৃহের ও প্রতিবাসী বর্গের মহা অসুখের ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে, এবং সংসারের পাপস্রোত আরও প্রবলবেগে পরিবর্দ্ধিত করে।

যে দেশে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে শিশু প্রকৃতপক্ষে জীবনের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে সক্ষম হইবে, সেই দেশে সেইপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করাই প্রশস্ত ও মঙ্গলদায়ক। সাধারণতঃ মানবপ্রকৃতি এক প্রকার হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানুসারে প্রকৃতির অনেক তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। আরও ইতিবৃত্ত, কিম্বদন্তী, পৌরাণিক কথা ইত্যাদি অনেক পরিমাণে দেশ বিশেষের জাতীয় জীবন সংগঠনে সাহায্য করে। এই সকল কারণ বশতঃ এক প্রকার শিক্ষা কখনই সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা সুবিহিত নহে।

জীবনের উদ্দেশ্য।

অর্থ গৃধ্নুর প্রতি।—ওহে ধনিন্! বল দেখি ভাই! তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তুমি ত দিবা রাত্রি ধনের উদ্দেশে ছুটিতেছ, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক নানাবিধ কষ্ট গণনা না করিয়া নিয়ত ধনোপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত থাক,

তোমাকে দেখিয়া বোধ হয় ধনোপার্জ্জন করাই যেন জীবনের এক মাত্র কার্য্য, বাস্তবিক কি তাই ?

ধনীর উত্তর।—"আহা! তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে, যার ঘরে ধন আছে তার কি না আছে ? সকল প্রকার সুখ ও আমোদ লাভের ধনই এক মাত্র উপায়।" ইত্যাকার ধনের অনেক মহিমা শুনিয়া আমি চিন্তা করিলাম ধনী যাহা বলিল তাহা কি সত্য ?

যশোলিপ্সুর প্রতি।—ভাই! তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ? দেখিতে পাই কেবল যশ পাইবার জন্য তুমি নানাবিধ উপায় অবলম্বন কর। আজি তুমি রাজ প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া "ইডেন বা অন্য কোন মহাপুরুষের "মেমোরিয়ালফণ্ডে" সহস্র সহস্র মুদ্রা দান কর, অথচ দেশীয় কোন সদনুষ্ঠানে তোমার হস্তমুষ্টি কখনও মুক্ত হয় না। কালি তুমি "টাউনহলে" ভোজ দিয়া ইংরাজ মহলে নাম কিনিতেছ, পরশ্ব তোমার এক জন নিতান্ত আত্মীয় অন্ন বস্ত্রের অভাবে তোমার দ্বারস্থ হইয়াও সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, সম্বাদ পত্রের স্তম্ভে তোমার নাম দেশ বিদেশে কীর্ত্তিত হয়, কিন্তু তোমার নিবাস পল্লিতে তোমার ভয়ে প্রকাশ্যে না হউক—অপ্রকাশ্যে, তোমার কত অপযশঃ কীর্ত্তিত হয়। কখন বা পূজাদি উপলক্ষে থিয়েটার, যাত্রা, বাইনাচ দিয়া মহা ধুমধাম কর। তোমাকে দেখিয়া বোধ হয় যেন তুমি যশোলাভ করিবার জন্য লালায়িত। বাস্তবিক যশ উপার্জ্জন করাই কি তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ?

যশোলিপ্সুর উত্তর।—"আহা! তাহাতে কি আর সন্দেহ

আছে। অপযশের ভাগী হওয়া বা জগতের অজ্ঞাত থাকা ত মৃত্যুর সমান। যাহাকে দশজনে চিনিল না তাহার আর বাঁচিয়া আবশ্যক কি?" এইরূপে যশোলিপ্সু আমাকে অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন।

জ্ঞানাভিমানী শিক্ষিতের প্রতি।—ভাই! তুমি যে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া থাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্য যে তুমি রাত্রি জাগরণাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষয় কর, তোমার অবলম্বিত কার্য্যই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?

জ্ঞানাভিমানীর উত্তর।—"তাহাও কি আবার জিজ্ঞাস্য! যে পুস্তক পাঠ করিতে না জানে, সভায় বক্তৃতাদি করিতে না পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি রূপ রত্ন লাভে অসমর্থ, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, তাহার ত পশু জন্ম আজিও ঘুচে নাই, আর উপাধিরত্ন আহরণ করিতে যে অক্ষম, সে একান্তই দীনহীন ও নিতান্ত কৃপাপাত্র।"

এই প্রকারে জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের পৃথক পৃথক উত্তর পাইয়া আমার মনে হইল যে, সকলের কথাই কিছু সত্য হইতে পারে না, যদি এক জনের সত্য হয় তবে অপরের কথা অসত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আত্মদৃষ্টি করিয়া দেখা যাউক কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত উত্তরের বিচার।

এক্ষণে, বিচার করিয়া দেখি, ধনোপার্জ্জনই কি আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে? আচ্ছা, আমি যদি রাশি রাশি ধনের অধিকারী হই, তাহা হইলে কি আমার সকল আশা মিটিবে? সহস্র বা লক্ষপতি হইয়াও যদি আমার

শরীর চিররুগ্নাবস্থায় থাকে বা আমি অসন্তুষ্ট চিত্ত হই, তাহা হইলে আমার রাশীকৃত ধন কি আমাকে সুখ ও শাস্তি দিতে পারিবে? সেই যে কৃপণ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া সমস্ত জীবনে সঞ্চিত মুদ্রাধার সকল দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করাতে যখন সে সকল তাহার সম্মুখে আনীত হইল, তখন সে কি করিয়াছিল? না, সে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, "হায়! হায়! এই সকল ধন ত আমাকে এ সময়ে সুখ দিতে পারিল না, ইহারা আমার সম্বন্ধে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধূলির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, আর পূর্ব্বেই বা ইহারা আমাকে কি সুখ দিয়াছে? নিশীথ সময়ে যখন দরিদ্র কাঙ্গাল, পর্ণকুটীরবাসী নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিরামদায়িনী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অকাতরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, আমি তখন, পাছে দস্যু ও তস্কর আমার বহু কষ্টোপার্জ্জিত ধন লইয়া যায় এই ভয়ে, সুনিদ্রার সুখ অনুভব করিতে বঞ্চিত হইয়াছি; যদিও কদাচিৎ নিদ্রাবেশ হইয়াছে, বায়ুতাড়িত বাতায়ন শব্দ ইত্যাদি অমূলক কারণে চমকিত হইয়া জাগ্রত হইয়াছি।" কৃপণের এই প্রকার খেদোক্তি কি আমাকে শিক্ষা দিবে না? সত্য বটে, অর্জ্জনস্পৃহা আমার অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু তাই বলিয়া ধনোপার্জ্জনই কি আমার সর্ব্বস্ব হইবে? আমার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে, যে তুচ্ছ ধন আমার অমর আত্মার চিরসম্বল হইতে পারিল না, সেই অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য কি আমার অমূল্য জীবন যাপিত হইবে? তবে অর্জ্জনস্পৃহা যদি পরমেশ্বর দিয়াছেন তবে আমি কি উপার্জ্জন করিব? অবশ্য সংসারে

থাকিয়া আমাকে ধন সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু ধনোপর্জ্জান করা আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ হইবে। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য কি? না সেই পরমেশ্বর রূপ পরম ধনকে লাভ করা। সেই অক্ষয় ধনোপার্জ্জনই আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে। বাস্তবিক পৃথিবীর ক্ষয়শীল ধন পাইয়া আমার আত্মার অনন্ত অর্জ্জনস্পৃহা নিবৃত্ত হয় না। পরমেশ্বর রূপ পরম ধনই আমার প্রাণের দারুণ পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম। এই স্বর্গীয় ধন লইয়া আমাকে পৃথিবীর ধনীদিগের ন্যায় উদ্বেগ-ভারে প্রপীড়িত হইতে হইবে না। আমি সচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইব, কারণ এই ধন এমনই আশ্চর্য্য যে ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারে। এই অমূল্য ধনের আধার আমার এই হৃদয়। তাই সাধু ভক্তগণ পৃথিবীর ধূলিসম ধন তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরকে প্রিয়তম হৃদয়ধন বলিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা যখন এই পরম ধনকে বিষয় ঘোরে হারাইয়া ফেলেন তখন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতে থাকেন। তাই তাঁহারা সংসারের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, বিষয় বিভব, স্ত্রী পুত্র, সকলের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, কেহ বা গভীর অরণ্য মাঝে, কেহ বা পর্ব্বতকন্দরে, কেহ বা প্রকৃতির ক্রোড়স্থ পর্ণকুটীরে যোগধ্যানে রত থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাউক যশোলাভ আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে কি না? বিচার করা যাউক যশ কি প্রকর ইহা মুখের বায়ু মাত্র, উচ্চারিত হইবামাত্র আকাশে—শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। যে যশ এত শূন্যগর্ভ, যাহা এত

চঞ্চল, অস্থায়ী যে এই যিনি যশের উচ্চ মন্দিরে উঠিলেন, পরক্ষণে আবার তিনিই সুদূরবর্ত্তী নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, যশ যাহা পরের মুখের কথা মাত্র, যাহা এত অসার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, সেই যশ কি আমার অমূল্য অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যস্থল হইবে? আবার দেখিতে পাই যশোলিপ্সু জীবদ্দশায় যাহা কিছু যশ উপার্জ্জন করিয়া গেলেন তাহা হয় ত তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরেই অন্তর্হিত হইল; লোকে ভুলিয়া আর তাঁহার নাম গ্রহণ করে না, কারণ তিনি এমন কিছু করেন নাই যদ্দ্বারা তাঁহার স্মৃতি সকলের নিকট প্রিয় হয়, তাঁহার কার্য্যকলাপ মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়ী হইবে? অপরন্তু দেখিতে পাই প্রকৃত উদারচেতা মহাত্মাগণ যশের চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ না হইয়া এমন সকল কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা অমর খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা শাক্যসিংহ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ঈশা, মুশা, মহম্মদ প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণ, অসংখ্য ধর্ম্মবীরগণ, যাঁহাদের শোণিতের উপর গির্জ্জা, মসজিদ ও ধর্ম্ম মন্দির সকলের চূড়া সগৌরবে ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান, তাঁহারা জগতের নিকট পরিচিত, আদৃত হইবার ইচ্ছা ক্ষণমাত্র হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও আপনাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে মনুষ্যগণ তাঁহাদের অমানুষী ক্রিয়া সকল পাঠ করিয়া অবাক্ হইতেছেন। তবে যশোলাভ করাই কি জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইবে? কখনই না।

তৃতীয়তঃ, জ্ঞানাভিমানীর উত্তর বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার কথায় আমার হৃদয় কখনই

সায় দিতে পারে না? মানিলাম রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া জগতের অনেকানেক গূঢ় সত্য সকল অবগত হইতে পারা যায়, মানিলাম উপাধিরত্ন সংগ্রহ করিতে পারিলে সমাজ মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া কি কয়েকটী কঠোর সত্য জানিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মুকুট পরিধান করিয়া যদি আমি জীবনের লক্ষ্য, সেই উচ্চ আদর্শ জ্ঞানময় ঈশ্বরকে জানিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার সেই জ্ঞানে কি হইবে? যে জ্ঞান জীবনকে উন্নত করিতে পারিল না, প্রলোভনের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমাকে বল দিতে পারিল না, যে জ্ঞান আমার মনে সৎসাহস সঞ্চার করিতে পারিল না, সেই অসার জ্ঞান লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে অর্থ গৃধ্নু! তুমি পরমার্থকে উপার্জ্জন কর; হে যশোলিপ্সু! তুমি লোক-প্রশংসার উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন কর; এবং হে জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত! জ্ঞানের গর্ব্ব পরিহার করিয়া বিনম্রভাবে জ্ঞানময় ঈশ্বরকে জানিতে সচেষ্ট হও।

জাতীয় অভ্যুত্থান।

সূর্য্যোদয়ে তরুপত্র বা তৃণোপরি একবিন্দু শিশির মধ্যে যেমন অসীম আকাশের প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়; সাধু ও জ্ঞানী মহাত্মাদিগের দুই একটী কথা বা লেখার মধ্যে যেমন গভীর ভাবরাশির সমাবেশ দেখা যায়; দারুণ শোকের কশাঘাত নিপীড়িত জনের একটী অস্ফুট কথা বা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যেমন তাহার সন্তপ্ত হৃদয়ের প্রগাঢ় দুঃখরাশির পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যায় ; প্রাণসম প্রিয়তম বন্ধু বা পত্নীর সামান্য একটী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে, দুই একটী কথা বা কার্য্যে যেমন অন্তরের অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া যায় ; তেমনি পুরাতন বা অধুনাতন কোন মহৎজাতীর জাতীয় বা ব্যক্তিগত এক একটী সামান্য ঘটনার পশ্চাতে জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলমন্ত্রস্বরূপ এক একটী মহৎভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত এই প্রকার একটী সামান্য অথচ সুমহৎ ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা জাতীয় উন্নতির প্রাণ কি, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রোমীয় ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, ক্রমাগত পিউনিক, মাসিডনীয় এবং স্পেনিস যুদ্ধের ঘাতপ্রতিঘাতে রোমের সাধারণতন্ত্র প্রণালী যখন বিক্ষোভিত হইয়াছিল, রাজ্যশাসনের ক্ষমতা সেনেট্ মহাসভার উপর অর্পিত থাকাতে যখন কুলীন পেট্রিসীয়গণ (Patricians) প্রভূত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন, মৌলিক প্লিবিয়ানগণ (Plebians) বা সাধারণ প্রজাবর্গের যখন যন্ত্রণার এক শেষ হইতে লাগিল, দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দের ন্যায্য স্বত্ব সকল যখন অবাধে পদদলিত হইতেছিল, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যখন পেট্রিসিয়গণ তাহাদের অসীম ধন, দুর্ব্বল প্লিবিয়ানদিগের দলনে নিয়োজিত করিয়া রাজনৈতিক প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত করিতেছিলেন, তৎকালে সুবিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয়া গ্রেকাই জননী কর্ণেলিয়া দ্বাদশটী সন্তান লইয়া বিধবা হয়েন। তিনি এরূপ পরিণামদর্শিতা ও সুবিবেচনার সহিত পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে মনোনিবেশ করেন যে, তিনি সকলের

হৃদয়গত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই বারটী সন্তানের মধ্যে সেম্প্রোনিয়স্ নাম্নী একমাত্র তনয়া এবং কেয়স্ গ্রেকস্ ও টাইবিরিয়স্ গ্রেকস্ নামক পুত্রদ্বয় ব্যতীত আর সকলেরই অপ্রাপ্তবয়সে মৃত্যু হয়। দয়াবতী প্রকৃতি গ্রেকাইদিগকে প্রবল প্রতিভা ও সদ্গুণ-রাশিবিভূষিত করিলেও পুত্রদ্বয় মাতৃদত্ত সুশিক্ষার নিকট বড় অল্প ঋণী ছিলেন না।

একদা কোন ধনীর কন্যা কর্ণেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া গ্রেকাই জননীকে মণি মুক্তা হীরকাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধিমতী কর্ণেলিয়া নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে সেই ধনাভিমানিনী রমণীকে ব্যাপৃত রাখিয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সমুজ্জ্বল রত্নসম পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাতৃগৃহে প্রবেশ করিল, অমনি মাতা কর্ণেলিয়া সেই ধন-গর্ব্বিতা রমণীকে পুত্রদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, "ইহারাই আমার মণিমুক্তা, ইহারাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আভরণ; আর এই প্রকার অলঙ্কারই সমাজের বল ও অবলম্বনস্বরূপ হইতে পারে; ইহাদের জ্যোতিঃ অত্যুজ্জ্বল মণি মুক্তা হীরক অপেক্ষা শত সহস্রগুণে অধিকতর দীপ্তিশালী"। ধন্য সেই রমণীরত্ন, যিনি এরূপ সন্তানের জননী হইয়াছেন, ধন্য সেই পুত্র যিনি এমন জননীকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন।

এই ক্ষুদ্র সামান্য অথচ সুমহৎ আখ্যায়িকা হইতে আমরা

জাতীয় অভ্যুত্থানের একটী অমূল্য সঙ্কেত শিক্ষা করিতে পারি। দেশের বাস্তবিক বল ও অবলম্বন কাহারা? কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয় উন্নতিরূপ সুশোভন অট্টালিকা অটল-ভাবে সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম? কোনও দেশ যখন নিতান্ত শোচনীয় অধোগতির একশেষ প্রাপ্ত হইয়া রসাতলে যাইতে থাকে, তখন কে সেই সুদীন অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন? যখন কোন দেশ দেবদুর্লভ স্বাধীনতা-ধনে বঞ্চিত হইয়া দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় জেতৃপদতলে দলিত ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে থাকে, তখন কে তাহাকে সেই দুর্গতির চরমাবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে সকল প্রকার স্বার্থপরতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে ধনমান ঐশ্বর্য্যের মমতায় জলাঞ্জলি দিতে,—এমন কি প্রিয়তম প্রাণকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নহেন? বাহিরের সভ্যতা, বাহিরের অসংখ্য বিলাসসামগ্রী কখন কি কোন জাতির মূলদেশ দৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়াছে? কখনই না, বরং ঐ সকল বহ্বাড়ম্বরে প্রমত্ত হইয়া কত দেশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসের প্রতি অক্ষর পরিষ্কাররূপে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহাত্মা লুথার বলেন:—

কোন দেশের সৌভাগ্য প্রচুর রাজস্বের উপর নির্ভর করে না, কিম্বা সেই দেশের দৃঢ় গঠিত দুর্গের উপর নির্ভর করে না, কিম্বা উহার প্রকাশ্য অট্টালিকার সৌন্দর্য্যের উপরও নির্ভর করে না; কিন্তু দেশের সৌভাগ্য দেশের উন্নত অধিবাসী এবং বিদ্বান, জ্ঞানী ও চরিত্রবান লোক সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; ইহাতেই দেশের

প্রকৃত প্রভাব, প্রকৃত বল, এবং প্রকৃত ক্ষমতা লক্ষিত হয়।”

নব্য আয়র্ল্যাণ্ডের একজন প্রধান নেতা, মহাত্মা কবিবর ডেভিস বলেন ঃ—

“স্বাধীনতা পরমেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত হইতে আইসে, এবং ইহার জন্য ধার্ম্মিক লোকের প্রয়োজন হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণই আমাদের দেশকে আর একবার একটী জাতিতে উন্নীত করিতে পারে।”

এখন তবে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য কি চাই। চাই কর্ণেলিয়ার মত গুণবতী রমণী, গ্রেকাই-দিগের মত কুলপাবন জাতিগৌরব পুত্র। এই প্রকার চরিত্রবতী রমণী ও সদ্গুণশালী পুত্রগণ “স্বর্গাদপি গরীয়সী” জন্মভূমির জন্য পুরাকালের স্পার্টান বা রাজপুত রমণী ও পুত্রের ন্যায়, অকাতরে অম্লান বদনে শত সহস্র নিগ্রহ সহ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশের অভ্যুত্থান সাধনে সক্ষম হয়েন। এই প্রকার পুত্র ও মাতা পাইলে যে কোন অধঃপতিত দেশের মলিন মুখ আবার উজ্জ্বল হইতে পারে। যে দেশে এই প্রকার রমণী ও পুত্ররত্নের সংখ্যা অধিক, সেই দেশই উজ্জ্বল অক্ষয় কীর্ত্তিলাভে সক্ষম হইয়াছে, ইতিহাস তাহা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, অতীত ভারতের অপূর্ব্ব কথা একবার স্মরণ করিলেই হইবে। এই প্রকার অনেক রমণী ও পুত্ররত্ন এক-কালে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সকল রমণী ও পুত্রগণ ভারতকে জগতের চক্ষে এক শ্রেষ্ঠ দেশ মধ্যে পরি-গণিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া

আমরা আজিও কত গৌরব করিয়া থাকি। কিন্তু আধুনিক ভারতের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। কয়জন এই প্রকার রমণী ও পুত্র দেখিতে পাইবেন? গ্রেকাই-জননী কর্ণেলিয়া ও তাঁহার পুত্রসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা কয়টা আপনার চক্ষে পতিত হইবে? কয়জন রমণী পার্থিব মণিমুক্তাদি রত্ন অগ্রাহ্য করিয়া গ্রেকাইদিগের মত পুত্রের মূল্য বুঝিয়া তাহাদিগকে আদর ও গৌরব করিয়া থাকেন? স্পার্টান ও রাজপুতরমণীগণ স্বহস্তে সন্তানগণকে সমরসাজ পরাইয়া ভীষণ সমরক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিতেন। আজ ভারতের কয়জন রমণী এই মহান দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন? যে দেশের অধিকাংশ লোক ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; অশন বসন প্রভৃতি সহজে জুটিলে যাহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, দেশের প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, এ জ্ঞান যাহাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় নাই; যে দেশে শিক্ষিত কৃতবিদ্য বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি সৎসাহসের ও নৈতিকবলের পরিচয় দিতে সক্ষম নহেন, কেহ কেহ আবার এতদূর অভিমানী যে অভিমানের পূজার অণুমাত্র ত্রুটি হইলে, মাতৃভূমিরও প্রকৃত হিতকর কার্য্যে স্বতঃপরতঃ সততই কণ্টক নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন; যে দেশে গ্রামে গ্রামে দলাদলির গণ্ডগোল; যে দেশে কোন জনহিতকর সমিতি ২।৪ বৎসরও সদ্ভাবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না; যে দেশে দেশের অর্দ্ধেক বলস্বরূপ নারীজাতির অশেষ দুরবস্থা; যে দেশে ধনকুবেরগণ

অর্থের সদ্ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বৃথা আমোদ প্রমোদে যাহাদের হস্ত উন্মুক্ত, কিন্তু দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধক অনুষ্ঠানে যাহাদের মুষ্টি কঠোররূপে আবদ্ধ; যে দেশে দরিদ্রগণ সামান্য উদরান্ন ও লজ্জানিবারক বসনের চিন্তায় দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত হইয়া জ্ঞানের মর্য্যাদা ও উপকারিতা বুঝিতে অক্ষম, সেই দেশের উত্থান এখনও সুদূর-পরাহত, সে দেশের অধিবাসিগণ এখনও জগতের চক্ষে একটী জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে অনেক বিলম্ব আছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা যদি সত্য না হইবে, তাহাহইলে আজ ভারতের অসংখ্য পুরুষ ও রমণীর নিকট চরিত্রবান্ অপেক্ষা ধনবানের অধিকতর আদর কেন? কেন আজ ভারতরমণী বস্ত্রালঙ্কারের জন্য এত অযথা লালায়িত? কেন ভারতসন্তান মৃত্যুকালে প্রিয়তম বংশধরদিগের জন্য প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন? অপরন্তু সেই সন্তানদিগকে চরিত্ররূপ অমূল্য ধনের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে ততদূর উৎসুক নহেন? কেন আজ ভারতের চারিদিকে অসংখ্য বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে? পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, প্রদেশে প্রদেশে, এত বৈষম্য কেন? কেন ইহার আর উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে ভারতে আজ চরিত্রবান্ লোকের সংখ্যা বিরল। মুষ্টিমেয় চরিত্রবান লোক লইয়া কত দেশ উত্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে,* আজ কিনা পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর মধ্যে এই প্রকার জনকয়েক লোকও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট!

ভারতের পুনরভ্যুদয়ের জন্য চরিত্রবান লোক চাই। তাঁহারাই অশেষ বৈষম্য দূর করিয়া অধঃপতিত ভারতকে পুনরুত্থিত করিবেন। তবে আর কেন নিদ্রা যাও, সকলে জাগ্রত হও, আপন আপন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ধন অপেক্ষা ইহার সমাদর করিতে শিক্ষা কর।—ইহাই ভারতের উত্থানের মূলশক্তি, ইহাই ভারতের দাঁড়াইবার অটল ভিত্তিভূমি, ইহাই ভারতের অভ্যুত্থানের মূলমন্ত্র।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব।

মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা প্রধানতঃ বুদ্ধি এবং কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে। অল্প চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে শোভানুভাবকতা বা সৌন্দর্য্যবোধ উহাদের মধ্যে অন্যতম একটী প্রধান প্রবৃত্তি। মনুষ্য সমাজের প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, নরনারীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির অল্পাধিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে সৌন্দর্য্যের আদর্শ অত্যন্ত বিসদৃশ—এমন কি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া শোভানুভাবকতা বৃত্তির আদৌ অসদ্ভাব হইতেছে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে। মানিলাম এক দেশের লোক যাহাকে সুন্দর বলিতেছে, অপর দেশের লোক তাহাকে সুন্দর না বলিয়া তদ্বিপরীতকে সুন্দর নামে অভিহিত করিতেছে—যেমন ছোট পা, ছোট চোক, চেপটা মুখ,

কাল দাঁত, রেখা মাত্র ভ্রূ ইত্যাদি চীন দেশীয় রূপসীর লক্ষণ; অপরন্তু অপরাপর দেশে উক্ত আকৃতির নারী "সুন্দরী" নামে অভিহিত হওয়া দূরে থাকুন "কুৎসিত"বলিয়া সকলেরই নিকট উপহাসাস্পদ হইবেন। কিন্তু সেই হেতু মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তির অভাব, এ কথা কখনই কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না। আমাদের দেশে সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা আপনাদিগকে সুশ্রী দেখাইবার জন্য শরীর ও পরিচ্ছদের নানাবিধ পারিপাট্য সাধনে যত্ন করে। তাহারা আপনাদিগের বাসগৃহ নানা রঙ্গে চিত্রিত করে, কেশ বিন্যাস করিয়া বিহঙ্গের চিত্র বিচিত্র পুচ্ছ তাহাতে সংলগ্ন করিয়া দেয়, বনলতা ও বনকুসুমাবলী তাহাদের অলঙ্কারের কার্য্য সাধন করে। এই অসভ্য জাতি হইতে সভ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সেখানে নরনারী কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নিয়ত লালায়িত হইতেছে।— কত চিত্র বিচিত্র হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল, তাজমহলের সুদৃশ্য চূড়া গগণ স্পর্শ করিল, কত দেশ হইতে কত শিল্পী আসিয়া বহুমূল্য প্রস্তর ও হীরকখণ্ডে তাহার শোভা সম্পাদন করিল, কত রমণীয় উদ্যান মনুষ্যের যত্ন ও বুদ্ধি বলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, মর্ত্ত্যের অমরাবতী সদৃশ পারিস নগরে পরিচ্ছদের কত পারিপাট্য সাধিত হইল, ঢাকা নগরীতে কতশত চিক্কণ বসন ও কাশ্মীরে জগৎবিখ্যাত শাল প্রস্তুত হইল, কামিনী শরীরের শোভা সম্পাদনার্থ স্বর্ণকারগণ কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার গঠন করিল, গমনাগমনের সুবিধার জন্য কত আশ্চর্য্য ও বিচিত্র যান নির্ম্মিত হইল, প্রকৃতির মোহন দৃশ্য স্থায়ী করিবার জন্য

রাফেলের হস্তে কতশত সুচারু চিত্র অঙ্কিত হইল, কল্পনার চক্ষে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিবার জন্য কবি ও চিত্রকর উভয়ে উভয়ের যন্ত্র, বর্ণ ও তূলিকা চালিত করিল—ভারতে কন্দর্প ও রতি, গ্রীসে ভিনস্, কিউপিড্, সাইসী প্রভৃতি অতুলিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী রত্ন সৃষ্ট হইল, ভাস্করগণ প্রস্তরখণ্ড সকলকে জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত করিল, তবুও মানবমন অমৃতসম সৌন্দর্য্যরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত নহে।—ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে সকলেই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী। সামান্য শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সে প্রফুল্ল কুসুম বা পূর্ণিমার শশধর দর্শন করত আকৃষ্ট হইয়া জননীর বক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে হস্ত প্রসারণ করে, আনন্দের লক্ষণ তাহার নয়নে ও সমগ্র বদনমণ্ডলে প্রকাশ পায়। শিশু যে সকল দ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করে, তাহা নানা বর্ণে চিত্রিত হয়; কেন না যাহা কিছু সুন্দর, তাহার প্রতি তাহার মন স্বতঃই আসক্ত হয়। আবার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, সে সকল কেবল কার্য্যসাধক মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা সুন্দর হওয়া চাই। সে যে পুস্তক পাঠ করিবে, তাহার বাঁধুনী উৎকৃষ্ট হওয়া চাই; সে যে পাদুকা পরিধান করিবে, তাহা কেবল অধিক দিন স্থায়ী হইলে চলিবে না, তাহা দেখিতে সুঠাম হওয়া চাই; সে যে বসন পরিধান করিবে, তাহা কেবল শরীরের আচ্ছাদক মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা সুদৃশ্য হওয়া চাই; যে ছত্র তাহার মস্তককে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে তাহা সুচারুরূপে গঠিত হওয়া চাই; এইরূপে সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্য স্পৃহার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিক ক্ষুদ্র শিশু

হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই সৌন্দর্য্যের দাস। কে জানে বিধাতা সৌন্দর্য্যের সহিত মানবমনকে কেমন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন? যাহারা আমার কেহ নয়, আমার পরিচিত বা আত্মীয় কেহই নয়, যাহাদিগকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, অথচ সেই সুন্দর বালক বালিকা পথ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেন ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া "তাহারা কে?" অবগত হই? অপরন্তু আরও কত বালক বালিকা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না! ঐ যে বিকসিত কুসুম চারিদিকে শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিয়া পবনভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, কেন আমার প্রাণ তাহা দেখিয়া আকৃষ্ট হইল?—ঐ যে ফলবান্ বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া ভূমিকে চুম্বন করিতেছে,—ঐ যে সুদূরব্যাপী শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদুমন্দ সমীরণে তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে, ঐ যে প্রশান্ত স্বচ্ছসরোবরবক্ষে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়া ও প্রফুল্ল পদ্ম ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, ঐ যে অভ্রভেদী অচল উর্দ্ধ শিরে দণ্ডায়মান,—ঐ যে স্রোতস্বতী বসুধার মেখলার ন্যায় শোভমানা,—ঐ যে নির্ঝরিণী ঝর্ ঝর্ শব্দে জলোদ্গীরণ করিতেছে,—ঐ যে বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট সুচারু বিহঙ্গের সুস্বর-লহরীতে দিগন্ত নিনাদিত,—ঐ যে তমস্বিনী রজনীতে অসংখ্য হীরকখণ্ড সদৃশ তারকাবলী উদয় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে,—ঐ যে নীলগগণে সূর্য্য সঞ্চরণশীল হেম থালের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় উদয়াস্ত হইতেছে,—ঐ যে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু সুন্দর রঙ্গে শোভা পাইতেছে,—ঐ যে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধরণী নানাবিধ মনোহর পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে,—

এই সকল অনিমেষ নয়নে দেখিবার জন্য কেন আমার মন প্রয়াসী? ইহাদিগকে না দেখিলে আমার বাঁচিবার কি কোন ব্যাঘাত হয়? না, তাহা নয়, তবে কেন আমার প্রাণ সে সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করে? অপর দিকে কেন আমি কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা না করি?—কেন আমি শুষ্ক বৃন্ত, সৌরভ বিহীন ম্লান পত্র, কুসুম ও ফলহীন বৃক্ষ, পদ্মহীন সরোবর, শস্য হীন ক্ষেত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রমাবিহীন গগণ ইত্যাকার পদার্থ নিচয় দেখিতে না চাই? ইহার কারণ কি এই নহে যে সেই সকল পদার্থ সৌন্দর্য্য-রত্নহারা হইয়াছে, তাই তাহারা নয়নানন্দকর নহে, তাই তাহারা আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত যে সৌন্দর্য্যের কথা হইল তাহা বাহ্য স্থূল সৌন্দর্য্য, যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর, যাহা জগতের সমস্ত নরনারী অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে সৌন্দর্য্য সূক্ষ্ম, নিগূঢ় ও অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদর্শী সুশিক্ষিত হৃদয়বান লোক ভিন্ন অন্য কেহ সে সৌন্দর্য্য-সুখ ভোগ করিতে সমর্থ নহে। সাধারণের চক্ষু যেখানে কেবল শূন্য দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে স্থল তিনি শোভাপূর্ণ দেখিয়া ভাব রাশিতে নিমগ্ন হন। সাধারণের চক্ষু যেখানে কিছুই দেখিতে না পাইয়া বা বস্তুর বাহ্য গঠনাদি দেখিয়া ক্ষান্ত হয়, তিনি সেই বস্তুর বাহ্যাবয়ব ভেদ করিয়া তন্নিহিত অভ্যন্তরীণ নিগূঢ় সৌন্দর্য্য রাশিতে ডুবিয়া যান, কিম্বা সেই বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া অন্য শত শত চিন্তায় প্রগাঢ়রূপে অভিনিবেশ করেন।

এই সকল দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার চক্ষু যেন সাধারণ চক্ষু হইতে স্বতন্ত্রভাবে জগৎ দর্শন করিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা সতত নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে, তাহারা কেমন করিয়া স্বর্গের দুর্লভ শোভা দেখিতে পাইবে? যে চক্ষু প্রকৃতির বহিরাবরণ ভেদ করিতে সক্ষম না হইল, তাহার পক্ষে জগতের অর্দ্ধেকের অধিক সুখভাণ্ডার রুদ্ধ রহিল। যে চক্ষু সম্মুখে অভিনীত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিগূঢ় ভাব মনে উদ্দীপিত করিতে সমর্থ না হইল, সে চক্ষু স্থূলদর্শী ভিন্ন আর কিছুই নহে। অশিক্ষিত চিন্তা-বিহীনদিগের সমক্ষে এই সুচারু সুশৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ বিসদৃশ, শৃঙ্খলা বিহীন পদার্থপুঞ্জের সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু প্রকৃত ভাবুক যিনি, তিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে এক নিগূঢ় শক্তি অবিরোধে সুন্দরভাবে কার্য্য করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যে পুলকিত হন। তিনি সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। মানবের প্রকৃতি, চরিত্র, হৃদয়,মন ও আত্মার অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া যান। তিনি উহাদিগের ভিতর এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান যাহা কবিকল্পনার অগোচর, যাহা কোন চিত্রকর অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহে, যাহা সকল প্রকার পার্থিব ভৌতিক সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে এবং যাহার কারণ অভৌতিক বলিয়া কেবল অনুভবাত্মক—বর্ণনীয় নহে। গোলাপ বা পূর্ণিমার শশধর অসাধারণ সৌন্দর্য্যে জগতের চক্ষু আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু গোলাপ বা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মবীরদিগের অনলোপম উৎসাহ,

অমিত চরিত্রের বল, অচলসম অবিচলিত হৃদয়, সকল প্রকার বিপদ ও নির্যাতনের মধ্যে অকুণ্ঠিত ধর্ম্মভাব এবং প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য জীবন দান কি শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ নহে? তাঁহাদের পরদুঃখকাতর হৃদয়, দীন দুঃখীর দুঃখের উপশমে অপরাজিত সহিষ্ণুতা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অজ্ঞান ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থ প্রাণপণ চেষ্টা, অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি, অপ্রেমের স্থানে প্রেম সংস্থাপন, জগতের হিতার্থ প্রাণ সমর্পণ কি শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ নহে?—দেশ-হিতৈষীর স্বদেশের দুর্গতি পরিহার নিমিত্ত ঐকান্তিক যত্ন, দিবানিশি দেশের হিতকর ও উন্নতিসাধক উপায় উদ্ভাবনে প্রগাঢ় চিন্তা—শয়নে স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থায় যে চিন্তার বিরাম নাই, কিসে জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইবে, কিসে দাসত্বের দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া বিদেশীয় জাতির অত্যাচার হইতে দেশ উদ্ধার হইবে, কিসে জনসাধারণের গৃহে গৃহে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে ইত্যাকার বিবিধ চিন্তা ও কার্য্যে জীবনক্ষেপ কি শতসহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ নহে? গৃহস্থ, প্রভাত হইবা মাত্র, স্ত্রীপুত্রকন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহদেবতা পরমেশ্বরের উপাসনান্তে দৈনন্দিন কার্য্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতেছেন; তাঁহার স্ত্রী সকল অবস্থায় তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী হইয়া যথার্থ "সহধর্ম্মিণী" নামের যোগ্যা হইয়াছেন; তাঁহার পুত্র কন্যা বিনীত ও বাধ্য হইয়া পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে; কলহ, বিবাদ, অপ্রেম, অশান্তি তাঁহার গৃহে স্থান পায় না, সেই গৃহের দৃশ্য কি মনোহর নহে? ইহার ভিতর কি সৌন্দর্য্য নিহিত নাই? ঐ যে মহাত্মা ঈশা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও নরের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জগতে

ঘোষণা করিলেন, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের জন্য অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও শত্রুর হিতার্থ জগৎপিতার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন "পিতঃ! তাহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা কি করিতেছে জানে না।" এই অমানুষী জীবনের দৃশ্য কি সুন্দর নহে?—ঐ যে মহাত্মা শাক্যসিংহ নরনারীর মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার জন্য রাজপুত্র হইয়াও সকল ঐশ্বর্য্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত দীনহীন ভিখারীর বেশে পিতার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এই মহাত্মার জীবনের দৃশ্য কি মনোহর নহে?—ঐ যে শ্রীচৈতন্য ভক্তিহীন নীরস প্রচণ্ড জ্ঞানাভিমানপূর্ণ বঙ্গে ভক্তিনদী প্রবাহিত করিবার জন্য বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ও জননী শচী দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল সুখভোগ হইত জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে প্রিয় "হরিনাম" ঘোষণা করিয়া বেড়াইলেন, ঘোর পাষণ্ড দুর্বৃত্ত জগাই মাধাইকে বিশ্বজনীন প্রেমদানে উদ্ধার করিলেন, যে জাতিভেদ প্রথা নরনারীর স্বাভাবিক ভ্রাতৃভগিনী ভাব দূর করিয়া দেয়, সকল প্রকার জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে, ভারতের অশেষ দুর্গতির কারণ সেই জাতিভেদ প্রথা যিনি উন্মূলন করিলেন, "ব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রভেদ" একথা আর যাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইল না, যবন হরিদাস ও হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য চণ্ডালও যাঁহার প্রেমালিঙ্গন প্রাপ্ত হইল, যিনি মধুর হরিনাম শুনাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন, সেই মধুময় জীবনের দৃশ্য কি মনোহর নহে? কতশত বৎসর অতীত হইল মহাত্মা ঈশা,

বুদ্ধ ও চৈতন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তবে কেন আজ পৃথিবীর লোক তাঁহাদের পবিত্র চরণে ভক্তিউপহার প্রদান করিতেছে? কেন তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছে? ইহার কারণ কি এই নহে যে তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ লোকচরিত্র হইতে শত সহস্রগুণে সুন্দর ছিল?— প্রাগুক্ত মহাত্মাদিগের চরিত্রের কয়েকটী বিশেষভাব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে তাঁহাদের চরিত্র কত মহৎ ও সুন্দর ছিল, দেখিবে যে তাঁহাদের চরিত্র অনুপম। স্বর্গ ও নরকে যে প্রভেদ, আলোক ও অন্ধকারে যে প্রভেদ, আমাদের ও তাঁহাদের চরিত্রগত পার্থক্য তদপেক্ষা অল্প নহে। যে মৃত্যুর নামে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়, কেননা কৃতান্ত আমাদিগকে পার্থিব সকল প্রকার প্রিয়তম পদার্থ হইতে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিবে, তাঁহারা সেই ভয়ানক মৃত্যুকে আপনাদিগের মত ও বিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য প্রিয়বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন! আমাদের শরীরে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে কতই ক্লেশ অনুভব করি, কিন্তু তাঁহারা কেহ বা তীক্ষ্ণধার লৌহ-শলাকায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা জ্বলন্ত চিতাতে আপনাদের শরীরকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন, কেহ বা অগ্নিময় লৌহ খট্টার উপর শায়িত হইয়া বলিয়াছেন "এক পাশ ভাজা ভাজা হইয়াছে, আর এক পাশ উল্টাইয়া দেও" ইত্যাকার লোমহর্ষণ কাণ্ড যাঁহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? ইতিহাস পাঠ করিয়া কত বিষয় শিক্ষা

করিয়াও আবার বিস্মৃত হইতে হয়, কিন্তু এ প্রকার ঘটনা কি কখন বিস্মৃত হইতে পারা যায়? ইংলণ্ডের রাজ্ঞী রক্তপিপাসু মেরীর সময়ে রিড্‌লী ও লাটিমার ঐ যে স্মিথফিল্‌ডের জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন, আর ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতে করিতে একজন অপরকে বলিতেছেন "ভ্রাতঃ! প্রফুল্ল হও, ভয় নাই, অদ্য আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।" এই দৃশ্য এই বাক্য কি কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন? মহাত্মা সার্ ফিলিপ্ সিড্‌নি রণক্ষেত্রে আহত হইয়া পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়াছেন, পানপাত্র চুম্বন করিতে উদ্যত, অমনি তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত মৃতকল্প সৈনিকের দারুণ পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে স্বহস্তস্থিত পানপাত্র অম্লানবদনে তাহাকে দিয়া বলিতেছেন "তোমার অভাব আমার অপেক্ষা অধিক" এই স্বর্গীয় দেবোপম দৃশ্য কি কেহ কখনও ভুলিতে পারেন? কখনই না। আমাদের হৃদয় এতদূর সঙ্কীর্ণ যে নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদয়ের প্রীতি প্রদান করিতে পারি না, যদি কেহ আমাদিগকে ভালবাসিলেন তবে তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারিলাম, কিন্তু তদ্বিপরীতাচরণ করিলে তাহাকে ভালবাসা দূরে থাকুক আমরা তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হই; কিন্তু মহাত্মা ঈশা শত্রুদিগকেও প্রীতি করিবার আদেশ ও স্বকীয় জীবনে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাত্মা শ্রীচৈতন্য শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, মাধাই নিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্তপাত করিলে, শিষ্যগণ প্রতিশোধ লইবার মানসে সকলেই উদ্যোগী, কিন্তু তিনি

সকলকেই প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "মাধাইরে মেরেছিস্ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না"। এই অমানুষী উদার প্রীতির পরিচয়, যে প্রীতি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, যাহা পাত্রাপাত্র ভেদ অপেক্ষা করে না, সত্য সত্যই জগতের চক্ষু চিরকাল আকৃষ্ট করিবে। আমরা রিপুপরবশ হইয়া কত সময় কত গর্হিত কার্য্য করিয়া জীবনকে কলঙ্কিত করি, শত প্রতিজ্ঞা করিয়াও ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বরানুরাগ এতদূর প্রবল ছিল, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এতদূর প্রগাঢ় ও স্বাভাবিক ছিল, যে তাঁহারা যে কেবল চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিতেন, পাপচিন্তা ও পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতেন তাহা নহে, কিন্তু সেই প্রকার চিন্তা ও আচরণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। এই সকল মনীষীদিগের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সামান্য জীবনের দুএকটী উল্লেখ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের জীবন কত অসার। ঐ যে একজন দরিদ্র চর্ম্মকার পোর্টস্মাউথ নগরে ছিন্নপাদুকা-সিবনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও একটী ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কুটীরে যে সকল বালক বালিকার পিতা মাতা বা অন্য কোন রক্ষক ছিল না, অথবা থাকিলেও যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, ধর্ম্মযাজক বা রাজপুরুষেরা যাহাদিগের অনুসন্ধান লইতেন না, সংসারের বিলাসপরায়ণ ধনীগণ আত্মসুখভোগে রত থাকাতে যাহাদের তত্ত্ব লইবার অবকাশ পাইতেন না, সেই সকল অনাথ বালক বালিকাদিগকে সমবেত করিয়া প্রত্যহ শিক্ষা প্রদান করিতেন; নিজের সামান্য অন্ন বস্ত্রের

সংস্থান করিবার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও যিনি পাঁচ শত ছিন্নবস্ত্রপরিহিত বালক বালিকাদিগকে দুঃখদুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মুচী—আমাদের জাত্যভিমানী হিন্দুজাতির মধ্যে যে অস্পৃশ্য বোধে সমাজের হেয় ও নিন্দিত—সেই মুচী জন্ পাউণ্ডস্ পাঁচ শতাধিক আত্মার সদ্গতি সাধন করিলেন। অহো! এতাদৃশ মহাত্মার জীবন কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত নহে? এ জীবনের কার্য্যদেখিয়া কি আমাদের নিজ জীবনের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হয় না? বাস্তবিক আমরা কি মনুষ্য? আমরা নিতান্তই জড়! তাই আমাদের জীবনের কোন মূল্য নাই, কোন মনোহারিতা নাই। যদি আমাদের জীবনের মূল্য থাকিত, যদি তাহাকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শত শত লোক আমাদের চরিত্র দেখিয়া আকৃষ্ট হইত। অনলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া পতঙ্গ যেমন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, মিষ্ট পদার্থের আঘ্রাণ পাইয়া পিপীলিকা, মক্ষিকা প্রভৃতি যেমন আকৃষ্ট হয়, সেই প্রকার আমাদের চরিত্র যদি মধুময় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইত তাহা হইলে দলে দলে লোক আকৃষ্ট হইত। যেখানে সৌন্দর্য্য সেই খানে ভালবাসা। ভালবাসার তত্ত্ব যিনি আলোচনা করিয়াছেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে সৌন্দর্য্য শারীরিক, মানসিক, বা আধ্যাত্মিক, যে প্রকার হউক, মানবহৃদয়কে অদৃশ্য বন্ধনে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তবে তুমি বিলাপ করিও না যে লোকে আমাকে গ্রাহ্য করিল না, সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি বধির হইয়া ক্ষুদ্র পরিমিত শক্তি হউক ক্ষতি নাই, সেই শক্তিমাত্র সম্বল লইয়া, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের

প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, জীবনে এক একটী ব্রত গ্রহণ কর, সেই ব্রত উদ্যাপনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাক, তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না, জীবন আপনা-হইতেই সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইবে, স্বর্গীয় লাবণ্য তোমার মুখে প্রতিফলিত হইবে। অপরন্তু যদি তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া দিবারাত্রি পশ্বাচারে রত থাক, হৃদয়ে পাপ পোষণ কর, তোমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দিন দিন হীনপ্রভ হইবে। আর তোমার পবিত্র বাল্যের হীরকোজ্জ্বল জ্যোতিঃ থাকিবে না, আর তোমার শৈশবের নয়নানন্দকর লাবণ্য মুখে বিরাজ করিবে না, তুমি পাপে পাপে জর্জ্জরিত হইয়া বিভৎস বেশ ধারণ করিবে। কত শত সুশ্রী পুরুষ ও রমণী পাপ কার্য্যে রত থাকিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাদের শারীরিক অশেষ সৌন্দর্য্য থাকিলেও তাহা-দের পানে তাকাইতে ভয় হয়, অপরন্তু কতশত ব্যক্তি শারীরিক সৌন্দর্য্যে হীন হইয়াও নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রভাবে সুন্দর ও প্রিয়-দর্শন হইয়াছেন। কবিগণ সুচারুচ্ছন্দে তাঁহাদের কীর্ত্তি গ্রথিত করিয়া অক্ষয় করিয়াছেন, চিত্রকরগণ তাঁহাদের মূর্ত্তি সাদরে অঙ্কিত করিয়া অমর করিয়াছেন, লোকে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, কখনও তাঁহা-দিগের প্রিয় স্মৃতি চিত্ত হইতে অপসৃতা করিতে ইচ্ছা করেন না।

যদি সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি আমাদের স্বাভাবিক ও সকল সুখের মূলীভূত কারণ হইল, তবে যেন আমরা সুশিক্ষার অভাবে এই শক্তিকে হ্রাস করিয়া না ফেলি, প্রকৃত সুন্দর কি, তাহা যেন বিচার করিতে সক্ষম হই, বাহ্যিক আকার-গত অসার পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া

যেন প্রকৃত নিত্য সৌন্দর্য্যের আস্বাদ লাভে বঞ্চিত না হই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন, সেই প্রকৃতিকে যিনি সুন্দর করিয়া সাজাইলেন, সেই বিশ্বকারণ পরম সুন্দরের দিকে অগ্রসর হই, সৌন্দর্য্যবোধ যদি স্বাভাবিক হইল, তবে যে সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কোনকালে যাহার পরিবর্ত্তন নাই, যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ সংসারের বিষম কোলাহল অতিক্রম করিয়া কেহ বা গভীর অরণ্যে, কেহ বা পর্ব্বতগুহায়, কেহ বা শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে যোগ ধ্যানে রত থাকিতেন, পার্থিব তাবৎ সুখকে জলাঞ্জলি দিতেন, সেই ভূমা সৌন্দর্য্যের প্রতি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি করাই যেন জীবনের কার্য্য হয়। পরম সুন্দর জগতের অধিপতি আমাদিগের সকলকে সেই চক্ষু প্রদান করুন যদ্দ্বারা তাঁহার সেই নিরাকার অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন চিরদিনের তরে পরিতৃপ্ত হয়; আমাদিগকে সেই কর্ণ প্রদান করুন যাহাতে আমরা তাঁহার সুন্দর নামসুধা পানে সমর্থ হই, এবং তাঁহার চরণ সংস্পর্শে আমাদিগের এই লৌহময় হৃদয়কে এরূপ বিগলিত করিয়া দিন যাহাতে তাঁহার প্রেমস্রোতে মিশিয়া অপার সুখশান্তি সম্ভোগ করিতে পারি।

সমাপ্তঃ।